প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি ২০১৯। ২০ টাকা

# ভয়েসমার্ক

আর্যসমাজ সংস্কৃতি #মিটু ‘পরকিয়া’ সোশ্যাল মিডিয়া ফসল বিমা যোজনা শোষক, শোষিত, রাজনীতি... নতুন দিন জাত-ধর্ম বস্তুবাচক শিক্ষা পদ্ধতি লাল ও কালো চাল আমিত্ব বিস্মৃতি ইন্টার্ন শিক্ষক কবিতা গল্প

# ভয়েস মার্ক

**দ্বি-মাসিক পত্রিকা**


**সম্পাদক :**
**মো. ফিরোজ হোসেন**

পত্রিকা সম্পর্কিত :
দ্বি-মাসিক পত্রিকা
প্রতি সংখ্যার মূল্য ২০ টাকা
গ্রাহক চাঁদা সডাক ১০০ টাকা। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
গ্রাহক পরিষেবায় যোগাযোগ : রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

**পত্রিকার যোগাযোগ স্থান :**
বহরমপুর : মো. আযাদ হোসেন, ৯৯৩২৮৩৭১৮৫
বর্ধমান : মো. আল আমিন, ৮১১৬২৭৯১৫২
বাঁকুড়া : রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২
দ: ২৪ পরগণা : মো. আরিফ হোসেন, ৮৯২৬৭৪৪১৪০
উত্তরবঙ্গ : মো. ফিরোজ হোসেন, ৯৪৩৪৬৫৫৬১০



**যোগাযোগ :**
পিরতলা, উপর ফতেপুর,
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮.
E-mail: voicemark19@gmail.com
Mob: 9434655610

# ভয়েস মার্ক

প্রথম বর্ষ  প্রথম সংখ্যা।  ফেব্রুয়ারি ২০১৯

সম্পাদক
মহ. ফিরোজ হোসেন
ferozhossain77@gmail.com.
WhatsApp : 9434655610

গ্রাহক পরিষেবা:  রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

নামলিপি ও প্রচ্ছদ চিত্র : হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

মূল্য : কুড়ি টাকা

মো. ফিরোজ হোসেন কর্তৃক পিরতলা, উপর ফতেপুর, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক কিস অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১০১ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়
**আর্থসমাজ সংস্কৃতি** ৫
সাম্প্রতিক ইশ্যু
**ভারতে #মিটু  আন্দোলন (?)** ৭
**‘পরকিয়া’ সম্পর্ক** ৯
**প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা** ১০
**নোট বাতিলের দুবছর** ১২
**‘সোশ্যাল’ মিডিয়া** ১৩
নতুন দিন : মানব চেতনার ক্রমোন্নত বার্তমানিকতা
**শ্রীচেতনিক** ১৫
শোষক, শোষিত, রাজনীতি, দর্শন, ধর্ম ও প্রথা পালনের আন্তঃসম্পর্ক কী?
**‘অস্তিত্ব’: বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা - ইমদাদুল হক** ১৭
আমিত্ব বিস্মৃতির পরিণাম
**কিংশুক** ২৮
জাত, ধর্ম ও আমরা
**শ্যামল কান্তি পাড়ুই** ৩১
‘অস্তিত্ব’ নিরিখে বস্তুবাচক শিক্ষা পদ্ধতি
**মহ. মিনারুল হক** ৩৫
ওষধি গুণ সম্পন্ন লাল ও কালো চাল
**অনুপম পাল** ৪২
ইন্টার্ন শিক্ষক – বিদ্যালয় শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রা
**কিংকর অধিকারী** ৪৪
**গল্প**
মহীন
**তানিয়া খাতুন** ৪৮
সীমানা ছাড়িয়ে
**বৈশালী রায়চৌধুরী** ৫১
**কবিতা**
নেতাজি
**সোহেল রানা (ফকির)** ৩০
শবরীমালা  ইন্টার্নশিপ ভিক্ষা ওরাও কাঁদছে
**অশনিকা ঋদ্ধি** ৩০, ৪৬, ৪৭
অঞ্জলি
**তানিয়া খাতুন** ৩৪
আই ওয়াশ
**রঞ্জন পাড়ুই** ৪৫
অন্ধকার গহ্বর
**মীর সাহেব হক** ৪১
**নিবন্ধ**
একটা ছেলে
**প্রিয়া কর্মকার** ৪৭

**সম্পাদকীয়**

# আর্থসমাজ সংস্কৃতি

ব্যক্তি মানুষ আর্থসমাজের ইউনিট। ভাষান্তরে ব্যক্তির ইউনিটগুলির বৃহত্তর সংযোগ গ্রন্থির নাম আর্থসমাজ। এই গ্রন্থিতে আমরা সংযুক্ত হই শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে। তাই ব্যক্তি অনুভূতিতে স্বতন্ত্র হলেও উৎপাদনে আর্থসমাজের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতায় আর্থসমাজে ব্যক্তি মানুষ দুটি সম্পর্কে যুক্ত হয়— শ্রম সম্পর্ক যার অন্য নাম আর্থসামাজিক সম্পর্ক। এটি স্বয়ং সম্পর্ক। শ্রম প্রক্রিয়ায় যুক্ত হলেই এই সম্পর্ক আপনিই গড়ে ওঠে। এই শ্রম সম্পর্কের মধ্যদিয়ে যে সম্পদ উৎপাদিত হয়, তার ভোগ দখল ও ব্যবহার বিধি প্রণয়ন করার জন্য আরেকটি সম্পর্কে মানুষকে আসতে হয়। যার নাম বার্তা বিনিময়ের সম্পর্ক, যা মানবিক। এটি আপনা আপনি গড়ে ওঠে না। গড়ে তুলতে হয়।

বার্তা বিনিময়ের সম্পর্ক অর্থাৎ মানবিক সম্পর্ক মানুষকে কেন গড়ে তুলতে হয়? শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরের সহযোগিতায় যারা আর্থসামাজিক ভাবে সম্পদ সৃষ্টি করল, সেই সম্পদের ভোগ দখল নিয়ে কেন তাদের বার্তা বিনিময় করতে হবে? এর কারণটি নিহিত মানুষের সৃষ্টিগত সত্তা পরিচিতিতে। বস্তুবিজ্ঞান নিরিখে সেই সত্তা নেতিবাচক প্রবণতা সম্পন্ন। ইতিবাচকতা সেখানে অন্তর্লীন। নেতি বাচকতার অন্যতম চরিত্র লক্ষণ অনধিকার দখল কামনা। দখল কামনায় সে অধিকার অনধিকার গুলিয়ে ফেলে। আর্থসামাজিক সম্পদকে ব্যক্তি কুক্ষিতে ঢুকিয়ে নিতে থাকে। আর্থসমাজের সব ইউনিটগুলি সমানভাবে তা পারে না। দেখা যায় গুটি কয়েক ব্যক্তি এই দখল কামনার অপশক্তিতে আর্থসমাজের সিংহভাগ সম্পদ কব্জা করে নেয়। আর্থসমাজ শ্রেণি বিভাজিত হয়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, উঞ্ছবৃত্তি, যৌনবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, দাসত্ব প্রভৃতি উপসর্গের ভিড়ে আর্থসমাজ সংক্রামিত হয়। অশান্তির অন্ধকারে আর্থসমাজ নিমজ্জিত হয়। মহাভারতের প্রতীকী বর্ণনায় যা কিষ্কিন্ধ্যা। উল্লিখিত সেই অপশক্তির নাম রক্ষণকামিতা। আর রক্ষণকামিতার ধারক বাহকরা বস্তুবিজ্ঞানের নিরিখে রক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

প্রশ্ন হল, রক্ষণকামী কুক্ষিবৃত্তির তলায় পড়ে দারিদ্র্যের অন্ধকারে যারা নিমজ্জিত হয়, তাদের কি অনধিকার দখল কামনা শূন্য হয়ে যায়? না, হয় না। কারণ সত্তায় সকলেই রক্ষণকামী। পার্থক্য কেবল এটুকু যে, যারা ধনের পাহাড় গড়ে, তাদের তা রক্ষা করার পাহারা বসাতে হয়। সেই পাহারাদারি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষভাবে তা প্রশাসনগত এবং পরোক্ষভাবে এই পাহারাদারি হরেক রকম। হরেক রকমের অর্থ একটাই। তার ধনের দিকে যেন নজর না পড়ে। অন্যদিকে সম্পদ হারা অংশের মানুষকে সেই অবাঞ্ছিত ধনের বোঝা বহন করতে হয় না। এখানেই মার্কসের বক্তব্য, সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই। এই শৃঙ্খলের স্বরূপ দ্বিবিধ। এক। তার দেহমনগত। দুই। রক্ষণকামিতার পাহারা।

আগের প্রশ্নে ফিরে আসা যাক। এখন নিশ্চয় বোধগম্য হচ্ছে মানুষকে কেন মানবিক বার্তা বিনিময়ের সম্পর্কে আসতে হয়। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদিত আর্থসামাজিক সম্পদের বস্তুগত ভোগনীতি রচনা করতে হয়। তর্ক, বিতর্ক সহ বহু আয়াস করতে হয়। যে প্লাটফর্মে তা করা হয়, সেটিই সাংস্কৃতিক প্লাটফর্ম। এখানে স্বাক্ষর রাখা যায় ফাইন আর্টস এর বিভিন্ন আঙ্গিকে, সুকুমার বৃত্তিগুলির পরিচর্যার মাধ্যমে। ভোগনীতি রচনার গোটা প্রেক্ষাপট ও তার রচনাকাল অধ্যায় সংস্কৃতিবাচক। তার আর্থসামাজিক প্রয়োগটি রাজনীতিবাচক।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় গঠিত চরিত্রের সংস্কৃতি চার্চিকরাই সেই ধনের প্রহরাকে ভেঙে ফেলে আর্থসমাজে বহতা নিয়ে আসে। বাস্তিলের পতন হয়,

রাশিয়ান জারের শীত প্রাসাদের শৃঙ্খল ভেঙে যায়। বাস্তিল বা শীত প্রাসাদের পতন কেবল একটি দুর্গের পতন নয়। তা বাতিল শ্রম সম্পর্কের পতনে মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রতীক। গঠিত চরিত্রের চার্চিকদের মহাভারতে পাণ্ডব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামে যারা মোমেন। আর অন্যরা, যারা সেই ধনের পাহারাদার বা তার সহযোগী তারাই কৌরব।

পূর্বেই উল্লিখিত যে, ধনের পাহারাদারি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। পরোক্ষ হরেক রকম পাহারাটাই সবচেয়ে মারাত্মক। যার মধ্যে অন্যতম ধারণার সংক্রমণ। যার আশ্রয় ঐতিহ্য। ঐতিহ্য কী? ধরুন, আজ আমরা সম্মিলিত মানবিক প্রয়াসে একটি ইতিবাচক আর্থসামাজিক ঘটনা ঘটালাম। যার ফলও ভোগ করলাম আর্থসামাজিকভাবে। আজকের প্রয়োজনের নিরিখে যা অত্যন্ত পজিটিভ। কিন্তু কাল যখন নতুন সমস্যা এসে হাজির হল, সেই সমস্যার কথা চিন্তা না করে আজকের দিনের ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এই ঢুকে পড়াটাই ঐতিহ্যে ঢুকে পড়া। গতকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা গুলি এবং সেই কেন্দ্রিক যে ধারণা, তাই ঐতিহ্য। বর্তমানের সমস্যা চিহ্নিত করণ, তার বিচার বিশ্লেষণ, তর্ক-বিতর্ক ও সমাধান প্রযুক্তি নির্মাণের যে সামগ্রিক কৃৎকলা (যার নাম আর্থসমাজ সংস্কৃতির চর্চা) তাতে মানুষকে প্রাণিত হতে না দেবার অপকৌশলই হল তথাকথিত ঐতিহ্যের মধ্যে মানুষকে ঢুকিয়ে দেওয়া। যাতে তারা সেই ধনের পাহাড় নিয়ে প্রশ্ন করতে না আসে।

বর্তমান জীবন সমস্যা সাংস্কৃতিক প্লাটফর্মে চর্চায় আসলেই তার সমাধানবাচক প্রযুক্তি আর্থসমাজে ধরা দেয়। যে চর্চাতেই মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হয়ে উঠে। আর সেই চর্চার মাধ্যম অর্থাৎ তার ভাষাও হয়ে ওঠে উন্নত। লক্ষ্য করুন, সংস্কৃত ও আরবী কত উন্নত ও ব্যঞ্জনাময় ভাষা। ভাষার এই উৎকর্ষ তো আপনা আপনি হয়নি। সেই জনপদের মানুষেরা সাংস্কৃতিক আত্মকর্ষণের মাধ্যমেই তা অর্জন করেছে। সেই ভাষাকেও সেই ধন পাহারাদারি অপশক্তি কিম্ভূতকিমাকার করে দিচ্ছে। দিচ্ছে বলে আস্ফালন করে তা ঠেকানো যায় না। তা ঠেকাতে হলে প্রয়োজন এই সাংস্কৃতিক প্লাটফর্মের শক্তি বাড়ানো। নিজেকে সাংস্কৃতিক করার যজ্ঞে অংশগ্রহণ।

কীভাবে এই চর্চায় অংশগ্রহণ করা যায়?

এর একেবারে গোড়ার কথা আমিত্ব জিজ্ঞাসা। ব্যক্তির নিজ সত্তার নেগেশনগুলিকে খুঁটিয়ে দেখা। সত্তায় নিহিত এই নেগেশনকে তাতেই সুপ্ত অ্যাফারমেশনে দ্বন্দ্বায়িত করা। অ্যাফারমেশনকে জাগানো। সেই দ্বন্দ্বের দ্বান্দ্বিকতায় নেগশনকে নিয়ন্ত্রণ করে উঠে আসা। এই উঠে আসা চেতনায় আর্থসমাজের কিস্কিন্ধ্যা অপসারণে ফাইন আর্টসের কব শিল্পে আত্মনিবেদন। যে কবশিল্পেই নগরাবদ্ধ সভ্যতার পতনে আর্য জ্ঞানের উত্থান। যার থেকেই পুরাণ, মহাকাব্য, বেদ-উপনিষদের অনাপেক্ষিক জ্ঞান ভাষ্য। যে কবশিল্পই বুদ্ধর নির্মাণ তত্ত্ব। যে কবশিল্পই মহম্মদীয় অনাপেক্ষিকতায় আলকোরানের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ভাষ্য। যে কবশিল্প ফরাসি বিপ্লবের ভিত্তি, যে কবশিল্প সোভিয়েত বিপ্লবের ভিত্তি।

উল্লেখ্য যে, ধন প্রহরার রক্ষণকামী অপশক্তি জ্ঞান ভাষ্য ও তার প্রায়োগিক সমকালকে ঐতিহ্যে মুড়িয়ে সেগুলিকে মানব জাতির ব্যবহার অযোগ্য করে দিয়েছে। তথাকথিত ঐতিহ্যের মধ্যে ঝোলা গুড়ে মাছির মত পড়ে গেলে সেই জ্ঞান ভাষ্যের সমকাল প্রয়োগ দিশা নির্দেশ করা যায় না। তা করতে গেলে দরকার নিজ সত্তার অন্ধকার মোচনের সংগ্রামে নিজেকে সাংস্কৃতিক করা।

## সাম্প্রতিক ইশ্যু

# ভারতে #মিটু আন্দোলন (?)

বলিউডের এবং সমাজের উপরের স্তরের কিছু সাংবাদিক নারীর বিস্মৃত জীবনের পাঁকঘাটার পরিণামে আর্থসামাজিক সংস্কৃতিতে নারীবাদী উপপ্লব টুইটার ফেসবুকে ঝড় তুলছে কিছু দিন ধরে। শাসক দলের একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কয়েকজন নারী সহকর্মীর যৌন হেনস্থার অভিযোগ এতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। রক্ষণকামী বাজার অর্থনীতির সেবাদাস গুটিকয়েক তথাকথিত উদার গণতন্ত্রী সংবাদকর্মী এই উপপ্লবের প্রবক্তা। যাদের যোগ আবার আমেরিকার ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজের সঙ্গে। হলিউডের একজন প্রযোজক পরিচালকের বিরুদ্ধে জনৈক অভিনেত্রীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে আমেরিকায় নারীবাদীরা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে গত বছর। সেই মাথা এবার দিল্লিতে চাড়া দিল তাদেরই উস্কানিতে। ইশ্যু কী? না, নারীরা যৌন হেনস্থার শিকার হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে। এই উপপ্লবের গালভরা নাম #মিটু।

ভারতে এর সূত্রপাত তনুশ্রী দত্ত নামের এক অভিনেত্রীর তার সহ অভিনেতা নানা পাটেকরের সঙ্গে অভিনয় কালীন যৌন অভব্যতার অভিযোগ নিয়ে। এরপর শুরু হয়ে গেল একের পর এক কাদা ছোঁড়া। চরিত্র হনন। অনেকের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। অনেকে আদালতের ফাঁদে পড়ল। বিনোদ দুয়া নামের একজন সিনিয়র জার্নালিস্টের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। সেই মন্ত্রী ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন। একজন কৌতুক শিল্পীর জীবন দূর্বিষহ হয়ে পড়ল। অনেক পরিচালক, অভিনেতার কাজ স্থগিত হয়ে গেল। ক্ষমতাসীন শাসক দলের সাড়ে চার বছরের অপরিণামদর্শী বহুকাণ্ডে জনগণের যখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, তখন দারুণ ইশ্যু উঠে এল !

প্রতিবেদকের আলোচনার ধরনে পাঠক কি নারী বিদ্বেষের গন্ধ পাচ্ছেন ? না, একটু সবুর করুন।

নারী কেন যৌন হেনস্থার শিকার হয়? কোন আর্থসমাজ সাংস্কৃতিক আবহে এই ঘটনা ঘটে? নারী পণ্য কখন? আর্থসমাজে নারী-পুরুষের এই যৌন অবদমন কীভাবে সংক্রামিত হয়? এর ভিত্তি মূলে রাজনৈতিক অর্থনীতি কীভাবে কাজ করে? এই প্রশ্নগুলি ছাড়া নারীবাদী খপ্পরে নারীর এই হেনস্থা হবার ঘটনাগুলি ছেড়ে দিলে তা রক্ষের হাত শক্ত করে। যেমন এখন করছে। ব্যাপক জনতার জীবন যন্ত্রণার কথা যারা বলছেন, যে গুটিকয়েক মানুষ, তাদের বিরুদ্ধেই সেই যন্ত্রণার শিকার একটি অংশকে লেলিয়ে দিয়ে আসলে রক্ষণকামিতা তার বিরুদ্ধে ওঠা প্রতিবাদকেই শেষ করতে চায়। এই কথাটি বুঝতে হবে।

আর্থসামাজিক উদবৃত্ত মূল্য ব্যক্তি-দখলে ধনরূপ নিয়ে নিলে আর্থসমাজ আর আর্থসমাজ থাকেনা। তা বিকৃত হয়ে যায়। বিকৃত আর্থসমাজে ঔচিত্য-অনৌচিত্য, রুচি-অরুচি, স্বাধীনতা-দাসত্ব, অধিকার-অনধিকার সব তালগোল পাকিয়ে যায়। এই রকম আর্থসমাজে থাকে কেবল জড় তাৎক্ষণিকতার মাতলামি। এই জড় তাৎক্ষণিকতার মাতলামির অন্যতম যৌন বিকৃতি। নারী তখন পণ্য। সুস্থ দাম্পত্যের সুস্থ যৌন জীবন এই আর্থসমাজে না থাকায় যৌন-নিগমও বিকৃত। আর এখান থেকেই আসে দৈনন্দিন জীবনের আনাচে কানাচে অর্থাৎ বাড়িতে, অফিসে, পথে, ঘাটে, যানবাহনে, পার্কে, দোকানে অহরহ ঘটে যাওয়া যৌন সুড়সুড়ির অপঘটনা। এই যৌন সুড়সুড়ি কি কেবল পুরুষের দিক থেকে? না, নারী-পুরুষ উভয়ের থেকেই। তাই টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব সম্পাদক এমজে আকবরের বিরুদ্ধে তার সাংবাদিক সহকর্মীরা কুড়ি তিরিশ বছর পর যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনলে, তা কি বস্তুগত মাপকাঠিতে ধোপে টেকে? টেকে না, কারণ প্রভাবশালী সম্পাদকের কাছ থেকে সুবিধা নেওয়ার বিনিময়ে যৌনতা, এই অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধেও ওঠে।

প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতনামা এডিটরের প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গুছালাম। তারপর একদিন 'কুড়ি কুড়ি বছরের পর' তাঁর বিরুদ্ধে যৌন লাঞ্ছনার অভিযোগ আনলাম। এতে অভিযোগের ভিত্তি থাকে? আর যারা অভিযোগ আনে তাদের সম্পর্কেই বা আর্থসমাজ কোন মনোভাব নেয় তা বুঝতে বাকি থাকেনা এই তথাকথিত আন্দোলনের মুখ থুবড়ে পড়া দেখে। অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিহীন এই সমস্ত সৌখিন আন্দোলনের এই পরিণামই ঘটে। ব্যক্তিক কিছু প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় বটে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারক বাহক ক্ষমতার আসন অক্ষুণ্ন রেখে #মিটু করবো, তাতে আখেরে লাভ সেই ক্ষমতারই। কারণ তাতে ক্ষমতা আপেক্ষিক আর্থসমাজ বস্তুর মৌলিক দাবী থেকে আপাত রেহাই পেয়ে যায়। নোট বাতিলের তুঘলকিপনার অভিঘাতে ব্যাপক জনতার যখন নাভিশ্বাস উঠছে, জি এস টি নামক ট্যাক্স কারবারের অপরিণাম দর্শিতায় small scale industry যখন ধ্বংসের মুখে পড়ল, কর্মহীন বেকার যখন কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে তখন #মিটুর ইশ্যু ক্ষমতার কাছে মোক্ষম মোড় ঘোরানোর হাতিয়ার। কিন্তু তা দিয়ে মানুষের যাপিত জীবনের যন্ত্রণাকে কতদিন দমিয়ে রাখা যায়? তাই এই তথাকথিত আন্দোলনের উপপ্লবের ঝড় যত দ্রুত ছড়িয়ে ছিল, তা মিইয়ে যেতেও সময় লাগল না।

প্রশ্ন হল, তাহলে যৌন হেনস্থার ঘটনা কি ঘটে না? হ্যাঁ, ঘটেই তো। ঘটে কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বিকৃত আর্থসমাজে বিকৃত যৌন কামনার সংক্রমণ এর জন্য দায়ী। তাহলে সেই বিকৃত আর্থসমাজকে সুস্থ করার দায় এসে যায় না কি সমকালীন নাগরিকদের উপর? তা করতে গেলে সেই বিকৃতির ধারক বাহক ক্ষমতা আর তার জিয়ন কাঠি অর্থাৎ মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার আর্থসমাজ সাংস্কৃতিক ও পরবর্তীতে রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়েই তা করতে হয়। রেডিমেড সমাধান নেই।

মুক্তবাজার অর্থনীতি কী করল? মুক্তবাজার অর্থনীতিতে আর্থসামাজিক উদবৃত্ত ব্যক্তি পুঁজিতে রূপ নিলে নারী তখন পণ্য। এই পণ্যের ভোগ দখলের জন্য যেন তেন প্রকার অপকাণ্ড আর্থসমাজে ঘটে। তাতে নারী ও নর উভয়েই অংশ নেয়। বলিউড কি নিচ্ছেনা, টলিউড কি নিচ্ছে না, যৌনবৃত্তি কি উঠে গেছে? যৌনবৃত্তির সংক্রমণ কি তথাকথিত স্বাধীন ইচ্ছার পেশা নির্বাচন? সেটা যে নয় মুক্তবাজার অর্থনীতির ঘরের লোকেরাই তা বলে। এই মুক্তবাজার অর্থনীতির মৌল কনসেপ্টে প্রতিটি মানুষ অ্যাডাম স্মিথ কথিত সেই 'ইকনোমিক ম্যান'। সে বাজারের ভাষায় কথা বলে। মানবিকতা, দায়বদ্ধতা, নীতি, সংস্কৃতির সে ধার ধারে না। সেই বাজার অর্থনীতিকে চলতে দেব নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই, একই সাথে ন্যায়নীতির পরাকাষ্ঠা সাজবো, তা নৈব নৈব চ।

কর্মক্ষেত্র কেবল নয়, জীবনের সব ক্ষেত্রেই নারী তথা মানবতার অপমান বস্তুগত জীবন চার্চিক মানুষ মেনে নেয় না। তারা হুজুগে আন্দোলন খাড়াও করে না। তাতে সামিলও হয় না। বরং তারা সেই সাংস্কৃতিক আবহ রচনা করতে থাকে যা এই অপমানের মূলটিকে আর্থসমাজ থেকে উৎপাটন করে।

# ‘পরকিয়া’ সম্পর্ক

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট ‘পরকিয়া’ সম্পর্ক বিষয়ে তার রায়-এ একে অপরাধমূলক আইনী ধারা থেকে মুক্ত করেছে। এ নিয়ে দেশে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই বিতর্কে একপক্ষ সব গেল গেল বলে চিৎকার করছে। অন্যপক্ষ বলছে, না, খুব ভাল হয়েছে। একটি সম্পর্কের দুদিকে নারী পুরুষ দুটি মানুষ থাকবে অথচ তার জন্য শাস্তি পাবে কেবল পুরুষটি। বেশ হয়েছে। ভাল হয়েছে। কী ভাল হয়েছে আর কী খারাপ হয়েছে তার চেয়ে বরং একটু বুঝে দেখার চেষ্টা করা যাক, এই ‘পরকিয়া’ সম্পর্ক ব্যাপারটি কী, কেন, কীভাবে? এটা কি ক্রিমিন্যাল, সিভিল আইনে শাস্তিযোগ্য নাকি আর্থসামাজিক কাঠগড়ায় বিচার্য? দাম্পত্য যাপনে দাম্পত্য সঙ্গীর কোন অভাব সমাজ কথিত এরকম সম্পর্কে ইন্ধন দিচ্ছে ?

আর্থসামাজিক শ্রম গ্রন্থিতে প্রেরণা সঞ্চারী ভূমিকা নেয় দাম্পত্য কো-ইউনিট। ব্যক্তি শ্রমগ্রন্থিগত হিসেবে আর্থসামাজিক ইউনিট। কিন্তু এই শ্রম ইউনিটকে প্রাণবন্ত করে তোলে দাম্পত্যের কো-ইউনিট। কীভাবে ?

নর হল দেহগতভাবে অম্ল প্রধান। নারী দেহগতভাবে ক্ষার প্রধান। নর চায় দেহগতভাবে ক্ষারত্ব আর মনগতভাবে শক্তিময় কমনীয়তা। নারী চায় দেহগতভাবে অম্লত্ব এবং মনগতভাবে শক্তিময় রমণীয়তা। যার ব্যালান্সে দাঁড়ায় আর্থসামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার নির্ভরতা। কিন্তু রক্ষণকামিতার খপ্পরে পারিবারিক শ্রম আর্থসামাজিক শ্রমে রূপান্তরিত না হলে নারী হীনমন্যতায় ভোগে আর নর ভোগে হীনমন্যতা সংক্রামিত শ্লাঘামন্যতায়। দাম্পত্য বিষিয়ে যায়।

বিষাক্ত দাম্পত্য কেবল হীনমন্য শ্লাঘামন্যতা বা হীনমন্যতা থেকেই সংক্রামিত হয়না। এর সাথে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত দাম্পত্যে মালিকানা সম্পর্ক। মন্ত্র পড়া হয়ে গেল মানেই সে আমার হল, আমি তার হলাম। অর্থাৎ দখল। দাম্পত্য সঙ্গী পরস্পরকে সম্পত্তি হিসেবে নিজের দখলের জিনিস ভাবতে শুরু করল। পরিণামে সম্পত্তি হারাবার ভয় প্রতি মুহূর্তে তাদের সঙ্গী হল। এখান থেকেই আসে দাম্পত্যে সন্দেহ রূপ দুর্বাসা। বিষ আরো গাঢ় হয়।

মন্ত্র পড়া মানেই যৌনতার যথেচ্ছ ছাড়পত্র নয়। অথচ চার দেওয়ালের মাঝে সময়ে-অসময়ে, দেহমনগত সুস্থতা-অসুস্থতায়, বিপরীত পরশহীন যৌনাচার দাম্পত্য বিষিয়ে তোলে।

প্রেম দ্বান্দ্বিক বস্তুভোগের বাস্তবতায় নিজেকে বর্তমান করতে না পারার ব্যর্থতায় জড় মাতলামি জীবনে প্রধান হয়ে গেলে দাম্পত্যের পরশবাচক দিকটি শূন্য হয়ে যায়। দাম্পত্য তখন পরশহীন জড়দাম্পত্য। পরশহীনতায় দাম্পত্যে শুভদৃষ্টি অর্থাৎ দাম্পত্য সঙ্গীর পরস্পরের প্রতি মঙ্গলময় দৃষ্টি থাকে না। দাম্পত্য হয়ে যায় শুকনো কাঠ । জীবনের রসবোধ তাতে তৃপ্ত হয় না। আবার মন্ত্রপড়া প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক গণ্ডিও ভাঙা যায়না, আইনের গেরোয় কিংবা নিরপত্তার গেরোয়। দাম্পত্যে অতৃপ্ত এই সঙ্গীরা তখন কী করে? সমাজ কথিত ‘পরকিয়া’ সম্পর্কের মধ্যে জীবনের রসধারা খুঁজতে যায়। তাতে তারা জীবনের রসবোধ খুঁজে পাক আর নাই পাক, জড়দাম্পত্য দাম্পত্য যতদিন ‘পরকিয়া’ সম্পর্ক ততদিন। আইন দিয়ে তা যেমন ঠেকানো যায় না, আইনের ফাঁস আলগা করেও তা ঠেকানো যায় না।

আসলে অবস্তুর আর্থসমাজ ক্ষমতা সুস্থ দাম্পত্যের প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকতা সে খাড়া করে পরিকল্পিত অর্থনীতির পথরোধ করে। এখান থেকেই দাম্পত্যে সংক্রামিত হয় হীনমন্যতা, শ্লাঘামনম্যতা, যৌতুক থেকে পণের বিভীষিকা। এই অবস্তুর আর্থসমাজ ক্ষমতাকে চিহ্নিত করে বস্তুগত আর্থসমাজ গঠনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতেই নিহিত সুস্থ দাম্পত্যের বীজ। সুস্থ দাম্পত্য থেকেই পরবর্তী জেনারেশন পায় মেধা প্রতিভা। এই মেধা প্রতিভা বন্ধ্যা আর্থসমাজ

সংস্কৃতিতে প্রাণ সঞ্চার করে। বেজে ওঠে সরস্বতীর বীণা। সেই বীণা ঝংকারের প্রেরণায় সাংস্কৃতিক ভাবকল্প রাজনৈতিক প্রযুক্তিতে রূপ নেয়। পরিকল্পিত অর্থনীতির বাস্তবায়নে বস্তুগত আর্থসমাজ গড়ে ওঠে। অবস্তুর আর্থসমাজ ক্ষমতা এই আতংকেই সেই মেধা প্রতিভার পথরোধ করার জন্যই দাম্পত্যে নারদ-দুর্বাসা প্রভৃতি সংক্রমণ করে।

তাহলে সুস্থ দাম্পত্য গঠনের উপায়?

বস্তুগত আর্থসমাজ গঠনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতেই সুস্থ দাম্পত্য গড়ে তোলা সম্ভব। এই কর্মসূচির একদিকে থাকে ব্যক্তির আত্মবিকেন্দ্রিকতার কর্ষণ। যাতে ব্যক্তি নিজ দেহমনের চর্চা করে। ব্যক্তি সত্তায় নিহিত নিয়ম ও অনিয়মকে খুঁটিয়ে দেখে। অনিময়কে নিয়ন্ত্রণ করে নিজেকে সম্প্রসারিত করে। এককথায় সে আর্থসমাজ সংক্রামিত অচেতন-অবচেতন অবস্থা থেকে নিজেকে সচেতন করার আমিত্ব সংগ্রাম শুরু করে। অন্যদিকে এই সংগ্রামে অর্জিত শক্তিতে আর্থসমাজকে সাংস্কৃতিক ভাবে প্রভাবিত করার কর্মসূচি নেয়। আমিত্ব সচেতনায় দাম্পত্য সঙ্গীর মালিকানা, অসুস্থ যৌনতা ও জড় ভোগের মাতলামি নিয়ন্ত্রিত হয়। দাম্পত্য পরশবাচক হয়ে ওঠে। আমিত্ব সচেতনার চর্চা থাকায় জীবন স্বরূপের রসবোধ প্রাণবন্ত হয়। বিপরীত সঙ্গীর শ্রম স্বাধীনতা না থাকলেও দাম্পত্যের বস্তুভোগে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। উল্লেখ্য যে, আমিত্ব সচেতনার এই চর্চা দাম্পত্য কো-ইউনিটের দুই সঙ্গীরই থাকা দরকার।

# প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা

২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বের জাতীয় কৃষিবিমা প্রকল্প ও সংশোধিত জাতীয় কৃষিবিমা প্রকল্প দুটিকে সংযুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী ফসলবিমা যোজনা (পিএমএফবিওয়াই) নামে নতুন প্রকল্প ঘোষণা করে। ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ দুটি অর্থ বছর শেষ হয়েছে। কিন্তু অন্য সব বিভাগের মত বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষেত্রেও কোন তথ্য প্রকাশ করেনি। হরিয়ানার আরটিআই কর্মী পিপি কাপুর ১২ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ আরটিআই এ্যাক্টে কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগের কাছে জানতে চান এই বিমা সম্পর্কিত কিছু তথ্য। কৃষি বিভাগের তরফে তাঁকে যে তথ্য দেয়, তা নিম্নরূপঃ-

- এই প্রকল্পে মোট ১১টি কোম্পানি গত দুবছরে প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা মুনাফা করেছে। কোম্পানিগুলি হল— আইসিআইসিআই লমবার্ড, রিলায়েন্স, টাটাএআইজি, ইউনিভারস্যাল, বাজাজ এলায়েন্স, ফিউচার, এসবিআই, এইচডিএফসি, ইফকো-টোকিও, কোলামন্ডলম এবং এআইসি। একমাত্র শেষেরটি ভারত সরকারের কোম্পানি। বলাবাহুল্য বাকিগুলো প্রাইভেট কোম্পানি।
- চারটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে এক বছরের মধ্য এক কোটি কৃষক এই বিমা প্রকল্প থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। ২০১৬-২০১৭ সালে এই প্রকল্পে ৫ কোটি ৭২ লক্ষ কৃষক যুক্ত হন। এক বছর পরে অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশে ৪০ লক্ষ, রাজস্থানে ৩১ লক্ষ, মহারাষ্ট্রে ১৯ লক্ষ এবং উত্তর প্রদেশে ১৪ লক্ষ কৃষক পরের বছর বিমা করেন নি।
- ২০১৬-১৭ সালে কোম্পানিগুলো কৃষকদের মোট ক্ষতিপূরণ দেয় ১৭৯০২.৪৭ কোটি টাকা। ২০১৭ -১৮ সালে ক্ষতি পূরণের মোট পরিমান ১৫৭১০.২৫ কোটি টাকা। কোম্পানির মোট

মুনাফা ৯৩৩৫.৬২ কোটি টাকা। অর্থাৎ কৃষকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি কমলেও কোম্পানির মুনাফা ৪০ শতাংশ বাড়ে।

- এই প্রকল্পের প্রথম বছর একমাত্র সরকারি কোম্পানি এআইসি অন্য ১০ টি প্রাইভেট কোম্পানির মতই এই প্রকল্পে যুক্ত ছিল। কোম্পানিটি মোট প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে ৭৯৬৮.৫৬ কোটি টাকা। ক্ষতিপূরণ দেয় ৫৩৭৩.৯৬ কোটি টাকা। কোম্পানিটির নিট মুনাফা ২০১০.৬০ কোটি টাকা। কিন্তু পরের বছর অর্থাৎ ২০১৭-১৮ সালে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সরকারি কোম্পানিটি এই প্রকল্পে আর ব্যবসা করল না।
- ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সালে এই প্রকল্পে যুক্ত মোট কৃষকের সংখ্যা ১০.৬০ কোটি। কোম্পানিগুলি মোট প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে ৪৯৪০৮ কোটি টাকা। ৪.২৭ কোটি কৃষককে মোট ক্ষতিপূরণ দেয় ৩৩৬১২ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই দুবছরে কোম্পানিগুলির মোট লাভ ১৫৭৯৫.২৬ কোটি টাকা।
- কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬-১৭ সালে কোম্পানির মুনাফা ৩২১.২৬ কোটি টাকা। ২০৭-১৮ সালে এই মুনাফা ৫৪৭.৮৭ কোটি টাকা। এই দুবছরে এই প্রকল্পে যুক্ত কৃষকের সংখ্যা যথাক্রমে ৪১.৩৩ লক্ষ ও ৩৯.০৯ লক্ষ।

উপরের তথ্যগুলি থেকে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, পিএমএফবিওয়াই প্রকল্পের ঘোষিত উদ্দেশ্য কৃষকের উপকার সাধন হলেও তা প্রাইভেট কোম্পানিগুলির মুনাফার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এরজন্য কোম্পানিগুলিকে পরিকাঠামোগত ব্যয় ছাড়া কোনো বিনিয়োগ করতে হয় না। অন্য দিকে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে বিস্তর টালবাহানা, কালক্ষেপ কোম্পানিগুলি করে চলেছে। ক্ষতিপূরণের আবেদনের দুমাসের মধ্যে কৃষককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা বিধিবদ্ধভাবে বলা থাকলেও তা কাজে পরিণত হয়নি। কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গত বছরের আবেদনের টাকা তারা এবছর মেটাচ্ছে।

একমাত্র সরকারি কোম্পানি এআইসি কেন দ্বিতীয় বছর ব্যবসা করল না তার কোনো সদুত্তর নেই। প্রথম বছর ২ হাজার কোটি টাকা লাভ করলেও কার নির্দেশে এবং কোন যুক্তিতে সরকারি কোম্পানিটি এই লাভজনক প্রকল্প থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল, তা বুঝতে কি সচেতন নাগরিকের খুব অসুবিধা হয়?

কেন্দ্রীয় সরকারের বহুল প্রচারিত এই প্রকল্পটির হাল থেকেও কি রাজ্যে রাজ্যে কৃষক বিক্ষোভের কারণ অনুমান করা যাচ্ছে না?

**ভয়েস মার্ক**
**পড়ুন**
**পড়ান**
**পাঠক-লেখক হোন।**

# নোট বাতিলের দুবছর

৮ই নভেম্বর ২০১৬ তারিখে এক অপরিণামদর্শী ঘোষণায় অর্থনীতির সারকুলেশনে থাকা ৮৬ শতাংশ টাকা ( ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট ) বাতিল বলে দেগে দেওয়া হয়েছিল দুবছর আগে। এই ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী তিনটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন- ১। কালো টাকা উদ্ধার। ২। জাল নোটের কারবার বন্ধ করা। ৩। সন্ত্রাসীদের ফানডিং বন্ধ করা। যদিও অর্থনীতিবিদরা তার বহু আগে থেকেই জানিয়ে আসছিলেন ভারতীয় অর্থনীতির মোট কালো টাকার সিংহ ভাগ বিদেশের ব্যাঙ্ক এবং জমি-বাড়ি-সোনা রূপে রয়েছে। ক্যাশ হিসেবে তা নেই। বা থাকলেও সেটি নগণ্য অংশ মাত্র। তবু এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। নোট বাতিলের কিছু দিনের মধ্যেই যখন উল্লিখিত তিনটি যুক্তিই আর টিকছে না, তখন বলা হল নোট বাতিলের মুখ্য উদ্দেশ্য ক্যাশলেস ইকোনমি। সেটিও ডুবছে দেখে বলা হল ট্যাক্স রেভিনিউ বাড়ানো এবং ট্যাক্সের আওতায় অর্থনীতিকে সচল করার কথা। পরবর্তীতে পরিসংখ্যান দেখিয়ে বলা হল নোট বাতিলের পর ট্যাক্স রেভিনিউ কী হারে বেড়েছে। দুবছর পর( ৮ই নভেম্বর ২০১৮ ) অর্থমন্ত্রী  অরুণ জেটলি সেই ট্যাক্সের যুক্তির সাথে আর একটি যুক্তি যোগ করে বলছেন, অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোয় নোট বাতিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

নোট বাতিলের ফলাফল একনজরে দেখে নেওয়া যাক-

১। নোট বাতিলের অব্যবহিত পরে এটিএম ও ব্যাঙ্কের লাইন সহ নানাবিধ দুর্ভোগে কমপক্ষে ১১৫ জন মানুষ প্রাণ হারান।

২। অর্থনীতিতে চাহিদা কমে যাওয়ায় ব্যবসা সংকট দেখা দেয়। বহু কোম্পানি দুবছর পরও ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

৩। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। এই অংশ এর আগে এমন মারাত্মক সমস্যায় পড়েনি। বহু ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়।

৪। ১৫ কোটি দিনমজুর বেশ কিছু সপ্তাহের জন্য কাজ হারায়। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনোমির (CMIE) সমীক্ষায় জানা গেছে ১.৫ মিলিয়ন কাজ নষ্ট হয়েছে।

৫। জিডিপি ১.৫ শতাংশ কমে যায়। ১.৫ শতাংশ জিডিপি কমার অর্থ ২.২৫ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি।

৬। নোট বাতিলের পর পুনরায় নোট ছাপানো সহ বাজারে টাকার জোগান দিতে কত খরচ হয়েছে তার অফিসিয়াল কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। স্বাধীন বিশ্লেষকদের মতে এই খরচ ২ লক্ষ কোটি টাকার কম নয়। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে নোট ছাপানোর খরচ ৩৪২১ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে এই খরচ ৭৯৬৫ কোটি টাকা।

৭। জাল নোটের ব্যবহার বেড়েছে । একটি হিসেবঃ-

| নোট | আর্থিক বছর | জাল নোটের সংখ্যা |
|---|---|---|
| ২০০০ | ২০১৭-১৮ | ১৭৯২৯ |
| | ২০১৬-১৭ | ৬৩৮ |
| ৫০০ | ২০১৭-১৮ | ৯৮৯২ |
| | ২০১৬-১৭ | ১৯৯ |

৮। নোট বাতিলের পর গত দুবছরে বেকারত্বের হার সর্বাধিক। এই হার ৬.১।

৯। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ান ২০১৭-১৮ এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ২৯ আগস্ট ২০১৮। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে নোট বাতিলের আগে বাজারে থাকা মোট ৫০০ ও ১০০০ টাকার ১৫.৪১৭ লক্ষকোটি টাকার মধ্যে ১৫.৩১ লক্ষকোটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। যার অর্থ ৯৯.৩ শতাংশ বাতিল টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ফেরত এসেছে। অর্থাৎ ১০৭২০ কোটি টাকা ব্যাঙ্কে ফেরেনি। যেখানে সরকারের হিসেবে এই টাকার পরিমান হল ৩ লক্ষ কোটি টাকা। যেটি কালো টাকা।

১০। ৪ নভেম্বর ২০১৬ নোট বাতিলের ৪ দিন আগে বাজারে মোট টাকার পরিমান ছিল ১৭.৯৮ লক্ষ কোটি। ১৯ অক্টোবর ২০১৮ এর হিসেবে বর্তমানে বাজারে টাকার পরিমান ১৯.৬৮ লক্ষ কোটি যা আগের থেকে ৯.৫ শতাংশ বেশি।

১১। নোট বাতিলের পর আয়কর দাতার সংখ্যা

বেড়েছে। ২০১৪ সালে আয়কর দাতার সংখ্যা ছিল ৪ কোটি। ২০১৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫.৪৩ কোটি। ২০১৮ সালের মার্চ পর্যন্ত এ সংখ্যা ৬.৮৪ কোটি।

১২। বিশ্বব্যাঙ্কের মতে ভারত নোট বাতিলের ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বর্তমানের ৭.৩ থেকে ২০১৯ এ ৭.৫ হবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু এই বৃদ্ধি কর্মহীন।

নোট বাতিলের দুবছর পর প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল বিশ্লেষণে কী পাচ্ছি? কেবল ভোগান্তি আর ভোগান্তি ! এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগের একটি স্বীকৃতিও পাওয়া গেছে। একটি আরটিআই প্রশ্নের উত্তরে কৃষি দপ্তর জানিয়েছে নোট বাতিলের ফলে কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছেন। সরকারের অর্থনীতিক উপদেষ্টা বলছেন এটি একটি মহাবিপর্যয়। আয়কর প্রশ্নে যা বলা হচ্ছে তা হল, স্বল্প আয়ের মানুষদের এর আওতায় আসতে বাধ্য করা হয়েছে। সেখানে বড় বড় কর্পোরেটদের কর ছাড় দেওয়া হয়েছে লক্ষ কোটি টাকা। অনাদায়ী ঋণ ব্যাঙ্কের খাতা থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। এক কথায় দেশের আর্থিক শৃঙ্খলা এক ধাক্কায় নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

[তথ্যসূত্র: দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, দি হিন্দু, দি প্রিন্ট, দি ক্যুইন্ট, আনন্দবাজার কাগজ এর ৮ই নভেম্বর ২০১৮ সংখ্যা.]

# ‘সোশ্যাল’ মিডিয়া

আজকাল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার পাশাপাশি ইনটারনেট মিডিয়া শক্তিশালী ভূমিকা নিচ্ছে আর্থসমাজ জীবনে। বিশ্বের যেকোন প্রান্তের যেকোন ঘটনা মুহূর্তে অপর প্রান্তের মানুষের গোচরে চলে আসছে। ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, ট্যুইটার, ইন্সটাগ্রাম আরো কত কী তার পোশাকি নাম।

শুধু ঘটনা নয়। মত প্রকাশ তথা জনমতকে প্রভাবিত করা আজকের দিনে খুব সোজা হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক উদাহরণ, মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন। সেখানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ট্রাম্পের পক্ষে জনমত প্রভাবিত করার। ফেসবুকের মালিক স্বীকার করে নিয়েছেন যে তার কোম্পানি ইউজার প্রাইভেসি কম্প্রোমাইজ করেছে।

ফেসবুক, ট্যুইটার ব্যবহার করে মুহূর্তে গুজব ছড়িয়ে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া, ঘৃণা ছড়ানো, চরিত্র হনন, সহিংসতা, যৌনবৃত্তি উসকানো অতি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে এটি করা খুব সোজা। যেমন ভারতে গত বছর থেকে এপর্যন্ত ৮০-৯০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে গণ পিটুনির ঘটনায়। এই ঘটনাগুলি ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ ব্যবহার করে ঘটানো হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এই মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। পর্যাপ্ত আইনি সংস্থান এবং প্রযুক্তিগত দুর্বলতার কারণে। এটি কাঠামোগত প্রশ্ন। কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার ইচ্ছে আছে কিনা সেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সম্প্রতি ট্যুইটারকে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে। তাতে ফল নেই। ফেসবুক জানিয়ে দিয়েছে তার কোনো সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি নেই। ‘সোশ্যাল মিডিয়া’ এই গালভরা নামে এই সব ইনটারনেট মিডিয়া ন্যূনতম দায়বদ্ধতা ছাড়াই জনজীবনকে কপটতার বিষে সংক্রামিত করে চলেছে।

সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহার জনিত কারণে তরুণদের মধ্যে অবসাদ

রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। মোবাইল ব্যবহার মূলত এই সমস্ত তথাকথিত সোশ্যাল সাইটগুলিতেই সর্বাধিক।

বই পড়ার আগ্রহ সীমিত হয়ে গেছে। ভাসমান কথার ফুলঝুরিতে ভেসে বেড়ানোর ফ্যাসন এতটাই সর্বগ্রাসী যে, কোনো তথ্যের সত্যতা যাচাই এর সাধারণ স্পৃহা পর্যন্ত শূন্য হয়ে পড়েছে।

এবার প্রশ্ন উঠবে এইসব সাইটগুলির কি আর্থসমাজে কোনো পজিটিভ ভূমিকা নেই? এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত আছে এদের চলাচলের মূল কারিকা শক্তি কী এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে। দেখা যাক।

মিডিয়াগুলির মালিকানা সংস্থাগুলি সবই প্রাইভেট পুঁজি চালিত। প্রাইভেট পুঁজি কী চায়? সে চায় মুনাফা। মুনাফা অর্জনই তার এক এবং এক মাত্র লক্ষ্য। মুনাফাকেন্দ্রিক এই পরিচালনার কি কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে? থাকেনা বলেই এই সব মাধ্যমগুলি এত অপকাণ্ডের পরও চুপচাপ। কেউ কেউ তো বলেই ফেলছে তার কোনো দায় নেই।

মাধ্যমগুলিকে কি ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করা যায় না? অনেকেই উদাহরণ দেবেন বাংলাদেশে শাহবাগ আন্দোলন, মিশরে তাহরির স্কোয়ারের আন্দোলন ইত্যাদির। হ্যাঁ, এগুলিতে তাৎক্ষণিক উত্তেজনা তৃপ্ত হলেও ওই পর্যন্তই। সেগুলিতে উঠে আসা ইতিবাচক ইশ্যুগুলি আর্থসামাজিক সমাধান যোগ্যতার মান উত্তীর্ণ হতে পারছে কই ! কিন্তু এর জন্য কি এই মাধ্যমগুলি দায়ী?

না। এরা দায়ী নয়। সমস্যাটি তাহলে কোথায়? হ্যাঁ, সমস্যাটির উৎস মাধ্যমগুলিতে নয়। এর উৎস আর্থসমাজ সংস্কৃতির আঙিনায় খুঁজতে হবে। আর্থসমাজ সংস্কৃতি কি বহতা? না তা পঙ্কিল? পঙ্কিল আর্থসমাজ সংস্কৃতির আবদ্ধতায় আর্থসমাজ সমস্যার সমাধানবাচক নীতি প্রণয়ন হয় না। পরিণামে সেই নীতির আর্থসামাজিক বাস্তবায়ন বাচক রাজনীতিও জন্ম নিতে পারেনা। এই বন্ধ্যা আর্থসমাজ সংস্কৃতির আবহে অতঃপর ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায় সু কু বাচক এথিক্সের আর্থসমাজে ঠাঁই হয় না। এখানেই রক্ষণকামের পোয়াবারো। এই বারো পোয়ার রক্ষণকামিতা তাই দশমাথার রাবণ হয়ে গোটা আর্থসমাজকে কুরেকুরে খায়।

আর্থসমাজ সংস্কৃতি আবদ্ধ কেন?

আর্থসামাজিক পরিচালক নেতৃত্ব যদি রক্ষণকামিতার প্রতিনিধিত্ব করে তখন তার কাজ হয় আর্থসামাজিক সম্পদকে ব্যক্তি কুক্ষিতে ধন রূপ দেওয়া এবং তার পাহারাদারি। কালাধন পাহারাদারির এই আর্থসমাজে সংস্কৃতির স্রোত বইতে শুরু করলে কালাধন হারাবার ভয় প্রতিনিয়ত। কারণ সংস্কৃতির বহতায় থাকে আর্থসমাজের অন্ধকারের উন্মোচন। সেই উন্মোচনে কালাধনের কারবারিরা চিহ্নিত হয়ে যায়। সংস্কৃতির এই উন্মোচনী প্রজ্ঞা যখন আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানী রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় রূপ নেয় তখন সেই কারবারিরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নির্বাসিত হয়। তারা এই নিয়ম জানে বলেই আর্থসমাজ সংস্কৃতির প্রবহমানতার গতিরোধ করে। ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আক্রমণ হানে । সেই আক্রমণের আজকের হাতিয়ার তাদের এই তথাকথিত সোশ্যাল মিডিয়া।

সমাধান? সেটি না হয় ফেসবুক/হোয়াটস অ্যাপের জঙ্গলে আপাত পথ হারানো তরুণদের উপর ছেড়ে দেওয়া যাক। দেখা যাক তারা সেই জঙ্গলের জংলিপনা থেকে কতদিনে বস্তুগত জীবন চর্চায় মনোনিবেশ করে?

প্রবন্ধ

# নতুন দিন : মানব চেতনার ক্রমোন্নত বার্তমানিকতা

শ্রীচেতনিক

মহাবিশ্বে দিনরাত্রির সূচনা থেকে তা একই ধারায় পুনঃপুন আবর্তিত। তার কী বা নতুন কী বা পুরাতন। তবু নতুন দিনের কথা হয়। কেন হয়?

মহাবিশ্বের প্রতিটি উপাদান মহাবিশ্বের নিয়মে নিয়মানুগ। এই নিয়মানুগতায় তা মানব জাতির সেবায় নিয়োজিত। সেই হিসেবে দিনরাত্রির আবর্তন একটি ন্যাচারাল ঘটনা। মহাবিশ্ব দেশ ও কালে বিশেষিত। কাল প্রসঙ্গে দিনরাত্রি অতীত ও বর্তমান কালে বিশেষিত হয়, হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সেটি সময়ের হিসেবের জন্য দরকার। তা বোঝা গেল। কিন্তু নতুন পুরানো বিশেষণ কেন? এইখানে চলে আসতে হয় মানব মনের হিসেব নিকেশে। তার সত্তার স্বরূপ যাচাইয়ে। আর সেই যাচনেই নিহিত নতুন পুরানো বিশেষণের তাৎপর্য।

প্রতিটি দিন তার প্রাকৃতিক বর্তনে নতুন। কেননা আজকের দিনটি অতীত হওয়া মানেই তা কালের গর্ভে বিলিন হয়ে যাওয়া। কিন্তু মানব মনে আজকের দিনটি যে ছাপ মেরে দেয় তা যদি উৎপাটন করা না হয় অর্থাৎ সে যদি নিজেকে বর্তমান না করে, তাহলে এই দিনে অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাগুলি তার মনের ভার হয়ে তাকে পীড়ন করে। আর এই পীড়ন থেকে মুক্তি আকাঙ্খায় সে নতুন দিনের প্রত্যাশা করতে থাকে কিন্তু নিজের মনকে নতুন করে না। করতে পারে না। এখানেই তার বন্দিত্ব। এই বন্দিত্ব নিয়ে সে টুকুর টুকুর চায়। আর প্রাকৃতিক কাল বর্তনে তার নিজেরই করা হিসেবে বছরের কোনো একটি বিশেষ দিনকে বছরের প্রথম তথা নতুন দিন হিসেবে আরেকটি অনুষ্ঠান ফেঁদে বসে। এই পৌনঃপুনিকতায় দিন যায়। পীড়ন কি তাতে ঘোঁচে? ঘোঁচার কথা নয় তা পূর্বেই উল্লিখিত।

কিন্তু প্রশ্ন হল সে তার মনকে বর্তমান করতে পারে না কেন? কারণ সে বন্দি থাকে । কোথায়, কার কাছে? তারই সত্তার নাকোচন বৃত্তির কাছে। কি এই নাকোচন বৃত্তি? সৃষ্টিগতভাবেই মানব সত্তার এক মেরুতে আত্মকেন্দিকতা অপর মেরুতে আত্মবিকেন্দ্রিকতা। আত্মকেন্দ্রিকতার না বাচক মেরুর প্রাধান্যেই তার পথ চলা শুরু হয়। এই না বাচক প্রবণতার আশ্রয় অতীত বাচক। সেই অতীত তথা ঘটে যাওয়া ঘটনার পৌনঃপুনিকতার আশ্রয়ে সেই মন তখন বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা বিমুখ। ঐতিহ্য বন্দি। সৃষ্টিহীন। সেই সৃষ্টিহীনতার পীড়নে তাকে ভুগতে হয় । অথচ তা থেকে সে বেরতেও পারে না। এই পীড়নে ভোগা মানুষই হল রক্ষের হাতিয়ার। রক্ষ হল সেই আত্মকেন্দ্রিকতারই চরম রূপ। যে খোলসে সে নিজে আবৃত সেই আবরণে সে গোটা আর্থসমাজকেও বেঁধে ফেলতে চায়। আর্থসামাজিক এই বাঁধন সে বাঁধে শ্রম তথা মূল্য চুরি করে। উৎপাদিত মূল্যের আর্থসামাজিক রূপটিকে কালারূপ দিয়ে। এই আর্থসামাজিক রূপটির নাম হল উদবৃত্ত মূল্য। যা সে মুনাফা নাম দিয়ে ব্যক্তি কুক্ষিতে ঢুকিয়ে নেয়। অথচ মুনাফা রূপী এই উদবৃত্ত মূল্যই আর্থসামাজিক বিকাশের অন্যতম প্রধান ভিত। এই ভিতটিকে কব্জা করে সে মানব মনকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেয়। যে মন তার নিজের ভারেই না বাচক। তার কাছে আর্থসমাজের মূল্য সম্পর্কের রক্ষ সংক্রামিত জটিলতা তাকে আরো অন্ধকারে ঢুকিয়ে দেয়। সেই অন্ধকার কিস্কিন্ধ্যায় রক্ষ রাজা হয়ে বসে। তাহলে এই কি তার নিয়তি? না, তা নয়। কিন্তু রক্ষ তাকে এটাই নিয়তি বলতে শেখায়। সে এটাকে নিয়তি বলে মেনে নিলে রক্ষের সাম্রাজ্য অটুট থাকে। অতঃপর থাকো তুমি ইনসিওর‌্যান্স, তাবিজ-কবজ আর জ্যোতিষ বাবা পির নিয়ে। আমার ইন্দ্রপুরিতে ভুল করেও নজর দিতে

এসো না। মানুষের কোন ইতিহাস নেই। এটাই চরম কথা।

রক্ষ যতই এই বুলি আওড়াক না কেন এ মানব জীবনের শেষ কথা হতে পারে না। হয় না । সত্তার না বাচক আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে আত্মবিকেন্দ্রিক জীবনায়নের আর্থসামাজিক বাস্তবতা তো মানুষ স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করেছে। সে ইতিহাস গড়েছে। জীবনকে আলোকময় করেছে। নতুন দিন নিয়ে এসেছে। কবে, কোথায়? ইতিহাসের বিগত অধ্যায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। কেন ফ্যারাওদের যূপকাঠ থেকে মোজেস নিক্রান্ত হননি? আর আর্থসমাজকে বের করেন নি? ব্রাহ্মণ্যবাদী কব্জা থেকে বুদ্ধ নিষ্ক্রান্ত হন নি? হজরত মোহাম্মদ(সঃ) নিস্ক্রান্ত হননি, আর আর্থসমাজকে বের করে আনেন নি? লেনিন, আর সোভিয়েত? হোচিমিন, মাও প্রমুখ? এইসব যুগান্তকারি ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে রক্ষ বেমালুম করে দিতে চায়। কারণ সেগুলি তার পরাজয়ের, তার বন্দিত্বের দলিল যে। তাহলে কী বলতে চাওয়া হচ্ছে? কথা তো পরিষ্কার। রক্ষ সংক্রামিত কিস্কিন্ধ্যা চরম নয়। ততদিনই তার আয়ূ যতদিন ব্যক্তি তার সত্তার অন্দরে বন্দি। তার এই বন্দিত্ব কাটবে কী করে?

এই বন্দিত্ব থেকে মুক্তির সূত্র তার আজ আর কালের পার্থক্য করতে পারার মধ্যেই নিহিত। আজকের আমি আর আগামী কালের আমি এর মধ্যে এতটুকু উদবর্তন না ঘটলে সে বন্দিই থেকে যায়। এই পার্থক্য অর্থাৎ উন্নততর বর্তমান নির্মাণ করা যায় মানুষের আর্থসামাজিক দেহপ্রবন্ধ বিধেয় বিধানের সম্যক অনুশীলনে। দেহপ্রবন্ধ বিধেয় বিধান ! সে আবার কী ? প্রতিটি মানুষ আর্থসামাজিক গ্রন্থির ইউনিট। এই ইউনিটগুলির শ্রমসম্পর্কিত সম্পর্কেই আর্থসমাজ গঠিত। আর প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা নিয়েই আর্থসমাজ সত্তা। তাই আর্থসমাজ সত্তার পরিচিতি মানব সত্তার পরিচিতিতেই স্পষ্ট। সেই পরিচিতিটি কী? তা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। না, সেই সত্তার আত্মকেন্দ্রিকতা আর আত্মবিকেন্দ্রিকতার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে আত্মকেন্দ্রিক মূঢ়তাকে পরাজিত করে আত্মবিকেন্দ্রিক বস্তুমুখীনতায় ঘটাতে পারে মানুষের জীবন মুক্তি। এই কাঙ্খিত মুক্তির বিধানটিই হল দেহপ্রবন্ধ বিধেয় বিধান। মানব সত্তা দেহপ্রকারেই মূর্ত। দেহস্থ এই সত্তার নাকোচন বৃত্তির মূলে রয়েছে তার দেহবৃত্তি তথা দেহগত অথশক্তি। এই অথশক্তিকে তার মনন শক্তির বশে আনতে হয়। বশে আনতে দরকার হয় দেহমনোবিজ্ঞানগত অনুশীলন। অনুশীলনের একদিকে পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ পূর্বপুরুষের নেতিবাচক গুণ বিযুক্ত হওয়া, ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানগত বিশেষণ থেকে নিজেকে পৃথক করা, নরযজ্ঞ অর্থাৎ দেহমনগত সাদনিক বিশেষণ থেকে মুক্ত হওয়া, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক ফর্ম্যাল মডেল বিশেষণ থেকে মুক্ত হওয়া ও ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ পদার্থের অনুষঙ্গগত কাল বিশেষণ বিযুক্ত হওয়ার আয়োজন করতে হয়। ক্রমশ...

# শোষক, শোষিত, রাজনীতি, দর্শন, ধর্ম ও প্রথা পালনের আন্তঃসম্পর্ক কী?

**'অস্তিত্ব': বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা - ইমদাদুল হক**

মানুষকে শ্রম দিয়ে উৎপাদন করে শ্রমমূল্য পেতে হয় ও পরিশীলিত জীবন যাপন করতে হয়। সে দৈনিক যে পরিমাণ খাবার খায় শ্রম দিয়ে তার থেকে মেধানুপাতিক হারে উদবৃত্ত মূল্য তৈরি করে। উৎপাদন ও শ্রমশক্তির নিয়মে সমকালীন আবশ্যিক মূল্য ও পুনরুৎপাদন মূল্য বিয়োগ করলে যা বাকি থাকে তা উদবৃত্ত মূল্য। শাসন ক্ষমতার তন্ত্রে বৃত্তিকর ইত্যাদির মাধ্যমে তা বিশেষিত হয় আর্থসামাজিকীকরণে। এই উদবৃত্ত মূল্যের নিয়ন্ত্রণই অর্থনীতি। যার জীবন উন্নয়নী বাস্তবানুগ বিন্যাসে আর্থসমাজ প্রযৌক্তিক প্রকৌশলী কৃৎকলাই রাজনীতি। যে রাজনীতির বাস্তবানুগ নেতৃত্ব হল সেই অর্থনীতির তত্ত্বাবধায়ক ও সেই বিন্যাস প্রযুক্তির প্রযোক্তা। সেই নেতৃত্বের বিন্যাসেই সেই সমাজের বিকাশ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে জানা দরকার, মানুষ যখন ঔচিত্য সচেতন তখন সে নাগরিক, যখন মূল্যের বিনিময় সচেতন তখন সে আর্থসামাজিক আর যখন মূল্যের অধিকার সচেতন তখন সে আর্থসমাজ-রাজনৈতিক। সেই সচেতনিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পালন ছাড়া মানুষের অধিকার, অধিকারবোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। দ্বান্দ্বিকতায় মন নিয়ন্ত্রণ করে চেতনার বিকাশ হলেই শ্রমের মূল্যায়ন ও মূল্যের বিভাজন সম্ভব। চেতনার বিকাশেই মানুষের ব্যক্তিকতা থেকে নৈর্ব্যক্তিকতায় উত্তরণ। নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্বই তাঁর উদবৃত্ত মূল্য মানবতার বিকাশে আর্থসামাজিক ফান্ডে অর্পণ করে। রাজনৈতিক তৎপরতায় সেই ফান্ডে প্রকল্প রূপায়ণ করে সেই সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে হয়। চেতনার বিকাশ না হলে সেই উদবৃত্ত মূল্য ব্যক্তি কুক্ষিতে হয়ে যায় ধন। অর্থাৎ নিম্ন চেতনার মানুষই আর্থসমাজ শ্রমের উদবৃত্ত মূল্য ও শ্রমিকের আবশ্যিক মূল্য কুক্ষিগত করে হয় দুর্যোধন বা আবর্জনা রূপ ধন। একদিকে বাড়তে থাকে ধনের আবর্জনা রূপ পুঁজি আর একদিকে বাড়তে থাকে দারিদ্র্য। অর্থনৈতিক বৈষম্যে সেই সমাজে এমন কিছু অপকর্ম হতে বাকী থাকে না যার সংক্রমণ হয় না। শোষক ও শোষিত উভয়েরই মন হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন। যা মানুষ তথা আর্থসমাজের বস্তু বিচ্ছিন্নতা। মানব জীবনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া। বস্তু অর্থে সত্য যার রূপান্তর হয় না। বস্তুভোগ মানে শান্তিভোগ না থাকায় মানুষ হয়ে যায় হঠকারি। সেই সমাজ থেকে শান্তি হারিয়ে যায়, মেধা-মানবতাও হারিয়ে যায়। মন নিয়ন্ত্রণে না থাকায় ধারণাবদ্ধতা, অপসংস্কৃতি আর জড়ভোগ সেই সমাজকে গ্রাস করে।

আর্থসমাজে দুই শ্রেণির মানুষ – এক শ্রেণি শোষণ করে আর এক শ্রেণি শোষিত হয়। যারা শোষিত হয় তাদের অনেকেই বুঝতে পারে না যে তারা শোষিত হচ্ছে, আবার অনেকে বুঝতে পারলেও তাদের কিছু করার থাকে না। কেন না প্রত্যক্ষ-রাজনীতির মোকাবিলা ছাড়া শোষণ নিপীড়ন বন্ধ করা যায় না, মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পায় না। রাজনীতিও দুই ধরনের – কোনো রাজনৈতিক দল কাজ করে শোষকের পক্ষে, আর কোনো রাজনৈতিক দলকে সেই সচেতনিক দায়িত্ববোধে কর্তব্য পালন করতে হয় শোষিতের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়ায়ে মানে পুঁজির বিরুদ্ধে। এই লড়াইয়ে রাজনৈতিক দলকে অবশ্যই নীতি-আদর্শবাদী হতে হয়। তার জন্য দর্শন প্রযৌক্তিক রাজনৈতিক দল গঠন করতে হয়। সেই লক্ষ্যে সেই সমাজ-মানসে দ্বন্দ্ব জাগাতে হয়। পুঁজির দ্বারা চালিত নীতি-আদর্শহীন দলীয় ক্ষমতা সেই সমাজে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে না। এই নিয়ন্ত্রণহীনতায় পুঁজির শোষণ বাড়তে থাকে। আর অনিয়ন্ত্রণই মুক্ত বাজার অর্থনীতি যা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি।

### দ্বন্দ্ব (Dialectic)

আত্মা বা আমিত্ব ও জৈবিকারূপ সদন প্রকৃতির দেহ নিয়েই মানুষ। আঁত অর্থাৎ অনুভূতি আর মা অর্থে তত্ত্ব, জ্ঞান, শক্তি। অর্থাৎ আত্মার সংজ্ঞা হল নিজের পরিচালনী অনুভূতির উদ্ভাবনী শক্তি। যা মানুষের উপলব্ধি করার ক্ষমতা, Power of feelings। তার সেই সদন প্রকৃতির বিকৃতিক দানবতা নিজের এই আমিত্ব শক্তিকেই মানতে চায় না। সেই মানতে না চাওয়াটাই তার নাস্তিক্য অর্থাৎ আদমকে সেজদা করতে না চাওয়া মানে তার অনুগত হতে না চাওয়া দেহরূপ সদন প্রকৃতির সত্তা অর্গলী শয়তানের না

বাচক ‘না’। সদন প্রকৃতির এই নাস্তিক্য ট্যাকল করাই মানুষের আমিত্বিক বর্তমানে থাকা। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিশীল ক্ষমতাও বাড়তে থাকে এবং মানবতা নিয়ামক নিজের পূর্ণ আমিত্ব গঠনে মানুষ বার্তমানিকই হয়। অর্থাৎ ‘হ্যাঁ’ বাচক আস্তিক্য ও ‘না’ বাচক নাস্তিক্য নিয়েই মানব সত্তা। না বাচক ‘না’কে ‘হ্যাঁ’ বাচক না দিয়ে নেগেট করে ‘হ্যাঁ’-এর বাস্তবায়ন করাই নন্দন তত্ত্ব। নিজেকে চ্যালেঞ্জ করাই সব থেকে কঠিন কাজ। এটিই কাবিরা মানে সব থেকে বড় প্রযুক্তি। মার্কসিয় দর্শনে যা থিওরি অব নেগেশন অব নেগেশন। তাই নিজের স্বরূপ দেখতে মানুষকে সর্বদা দ্বন্দ্বে থাকতে হয়। ‘হ্যাঁ’ সৃষ্টি করে তাই মানুষের মধ্যে আছে সৃষ্টির তাগিদ, ‘না’ সেই সৃষ্টির তাগিদকে আটকায়, তাই মানুষের মধ্যে আছে ধ্বংসের তাড়না। মানুষের এই সৃষ্টি করার তাগিদ সম্পাদনী যতটুকু ‘হ্যাঁ’ ততটুকুই তার আপেক্ষিক বস্তু। কেউ কোনো কাজ সহজেই করতে পারে এবং সে সেই কাজটি করার ইচ্ছা করলেও ধীরে ধীরে তার তাগিদ বা ইচ্ছাটা ম্লান হয়ে যায়। কিভাবে হয় তা মানুষ খেয়াল করে না। যেমন কেউ কোনো কিছু করার তাগিদ অনুভব করল, পরক্ষণেই ভাবে একটু পরে করছি। কিন্তু সেই পরকাল (এখনকার পর) বাচক ভবিষ্যৎ কিছুতেই বর্তমান হয় না অর্থাৎ সেই কাজ আর হয়ে ওঠে না। ‘হ্যাঁ’ ‘না’-এর সীমাকে অতিক্রম করে ‘না’কে পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারে। যেহেতু ‘না’-ই সংক্রমণ করে আমিত্বকে, তাই ‘না’কে নিয়ন্ত্রণ করেই আমিত্বকে শুদ্ধ মানে সংস্কৃত করতে হয়। এই শুদ্ধকরণের জন্য দেহরূপ সদন প্রকৃতির কালোরূপ তমোশক্তি বা শয়তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। যেমন ‘তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে’। এখানে তোমারে বলতে তমোশক্তি অর্থাৎ রক্ষকে বোঝাচ্ছে, গো অর্থে আমিত্ব বা শিব, কুল অর্থে বংশ। অর্থাৎ যেখানে শিবশক্তি বাচক তার বংশ বৃদ্ধি পায় সেখানেই জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম-এর ত্রিশূল প্রযুক্তি দ্বারা তমো বধ হয়। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক চর্চায় ঘুমন্ত আর্থসমাজে যত দ্বন্দ্ব জাগানো যাবে ততই সেখানে মানবিক শক্তির উত্থান ঘটবে এবং মানবিক শক্তির ঐক্যেই দানবিক শক্তির পরাজয় ঘটবে। এই শুদ্ধকরণেই ব্যক্তির সুন্নত প্রযৌক্তিক আত্মগঠন। আত্মগঠনী দলীয় ঐক্যে (ফরজিয়া) আর্থসমাজে ‘হ্যাঁ’-এর প্রতিষ্ঠা করাই মানব জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো কৃৎকলাতেই জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা, আর্থসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা। এই শান্তি প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে সেই সমাজকে সর্বদা দ্বান্দ্বিকতায় (dialectic practice) থাকতে হয় এবং নেতৃত্বকে দ্বন্দ্বের উত্তরণ ঘটাতে হয়। যে উত্তরণে তাঁর চেতনার বিকাশ হয়, মনের ক্যানভাস পরিস্কার হয়। পরকাল বাচক ভবিষ্যৎ মনের ক্যানভাসে উপলব্ধি করে, চেতনার প্রযুক্তি নির্মাণ করে ধৃতরাষ্ট্রিক সমাজকে জাগ্রত করতে হয়। সেই সমাজে ত্রিশূল ধর নেতৃত্বের জন্ম হয়। শম অর্থে শান্তি, স্থিরতা। দ্বান্দ্বিকতায় থাকা মানে নিজেকে জিজ্ঞাসা করা, মানে আমিত্ব বা শিবকে জিজ্ঞাসা করেই সঠিক কাজ করতে হয়। যে কোনো কাজ করতে মানুষকে জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম-এর ত্রিশূল প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হয়। যিনি স্থিরতায় ত্রিশূল প্রযুক্তি প্রয়োগে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনিই শিবের শংকর (শম+কর)। এই প্রযুক্তি প্রায়োগিক সাফল্যেই সৃষ্টির সুর, তাই ত্রিশূলের সাথে ডুগডুগি,য়খন আমিত্ব জাগ্রত।এই জন্য গোটা মহাভারত জুড়ে দেখানো হয়েছে যুধিষ্ঠির, অর্জুন মানে পাণ্ডব সহ শ্রীকৃষ্ণের দ্বন্দ্ব। কিন্তু ভীষ্মের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, ‘হ্যাঁ’ ‘না’-এর পার্থক্য করতে না পারা মূঢ়ত্বে যার নুন খায় তারই গুণ গায়। ঝাপসা মনের ক্যানভাসে কৌরবরা নিজেদের পরকাল বাচক ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না বলেই তাদেরকে কুরুক্ষেত্রের ময়দানে হাজির হতে হয়।

**মন ও অর্থনীতিঃ**

মন হল মানব আরূপস্থ ইতি ও নেতি শক্তির সংঘটক। এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বেই আমিত্বের বিবর্তন, জাগরণ। আর আমিত্ব বিবর্তনেই সৃষ্টি। দ্বান্দ্বিক সচেতনতায় মন একক, যেখানে পরিকল্পনার ঘটনা মনেই আগে ঘটে যায় পরে ঘটনাস্থলে তার অনুষ্ঠান হয়। মন বা ইচ্ছার তিনটি পর্যায় –

১) **কামনা** – সৃষ্টিগতভাবেই মানুষ সত্তার অতল তলী। সেই অতল তলা থেকে উঠে আসতে চাওয়াটিই মানুষের মেধা। আর সেই চাওয়ারই মেধা অর্জনে যতক্ষণ অন্তর্লীন ততক্ষণ সে

দ্বন্দ্বহীনতায় অবচেতন। যতক্ষণ অবচেতন ততক্ষণ সে উপকরণমুখী। যতক্ষণ উপকরণমুখী ততক্ষণ সে অনধিকার দখলদার। যতক্ষণ সে অনধিকার দখলদার ততক্ষণ প্রয়োজনের সীমারেখা তার অজানা। সেই সীমারেখা অজানা হওয়াতেই তার আমিত্বাভি প্রীতিরই ইতিবাচক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটে যায়। সেই বিচ্যুতিতেই গুলিয়ে যায় তার শুভ-অশুভ-এর সম্যক পরিচয় বাচক অনুভূতি। যে গুলিয়ে যাওয়া অনুভূতিতে তার চাওয়া পাওয়ার যুক্তিও অপযুক্তির সাথে গুলিয়ে যায়। আর সেই গুলিয়ে যাওয়া মানেই জড়ভোগের সাথে বস্তুভোগের তফাত করতে না পারা। আর সেই তফাত করতে না পারা মানেই আর্থসামাজিক লুকোচুরি। আর সেই লুকোচুরিতেই নিজের ঘরে সিঁধ মারা, উদবৃত্ত মূল্য সেই সমাজে অর্পণ করতে পারে না। এই নিজের ঘরে সিঁধ মেরে কুক্ষি করা ধনই তার দুর্যোধন। জিজ্ঞাসু নয়, সেই সমাজের পাঁকে আটকে যাওয়া নিম্ন চেতনার অনভিব্যক্ত মানুষই গণ। যা থেকে সংক্রামিত মানুষ আর তার আর্থসমাজকে জিজ্ঞাসাবাচক পরিদর্শন করাটিই হল অষ্টাদশী পর্ব মহাভারতের সারবত্তা। যে সারবত্তায় সত্তার অতল তলা বিশেষিত কামনা থেকে বাসনায় উঠে আসতে পারার প্রযুক্তিই নিষ্কাম তত্ত্ব।

২) **বাসনা** – নিষ্কাম বা কামনা উত্তরণে অর্থাৎ নেগেশন নিয়ন্ত্রণে মানুষ ক্রমেই হয় দেহমনের নিয়ন্ত্রণে সচেতন। সেই সচেতনায় প্রয়োজনের সীমায় সে নিজেকে রাখতে চায়। আর্থসামাজিক শ্রম দিয়ে শ্রমিক যে মূল্য উৎপাদন করে, সেই মূল্য বিভাজন ও উদবৃত্ত মূল্য আর্থসামাজিক ফান্ডে অর্পণ করে। মানুষ জিজ্ঞাসু হলেই চেতনার কর্ষণ হয়। চেতনার হল্যা কর্ষণেই শান্তিবাচক সীতার জন্ম। তাই যারা নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, তারা অভিব্যক্ত জন। আর জিজ্ঞাসা প্রযুক্তির প্রযোক্তা মানে জনক রাজাই সীতার জন্ম দেন।

৩) **এষণা** – এই উত্তম পর্যায়ে মানুষের প্রায়োগিক ইচ্ছাটিই অনুসন্ধানী। সীতা অর্থাৎ শান্তিবাচক আর্থসমাজ মানবতা যখন শোষণ, দুর্নীতি, অরাজকতা ইত্যাদির অন্ধকার কিষ্কিন্ধ্যায় হারিয়ে যায় মানুষ তখন এষণা বৃত্তিক ইচ্ছায় জিজ্ঞাসু হলে তার জিজ্ঞাসার ফোকাশ সেই কিষ্কিন্ধ্যায় অবশ্যই পড়ে। সেই ফোকাশে বস্তু চর্চা অর্জনী মেধা অর্থাৎ আমিত্ব বা 'গো'-র এষণা মানে গবেষণা প্রায়োগিক বৃন্দাবনী প্রযুক্তির বাস্তবতায় আর্থসমাজে নন্দকানন প্রতিষ্ঠা করতেও পারে। যে প্রতিষ্ঠা বাস্তবতার বস্তুত্বই হল আর্যত্ব মানে সভ্যতা। এই পর্যায়ে মানুষ গবেষক। গবেষণা লব্ধ বিষয়বস্তু রণকৌশলে প্রয়োগ করেই সেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা মানে সীতা উদ্ধার করতে হয়। যিনি জিজ্ঞাসু ও সংগ্রামী তিনি রণ।

অর্থাৎ মনই মানুষের বিধায়ক। দ্বান্দ্বিকতায় মানে dialectic প্র্যাকটিসেই মনের উৎকর্ষ সাধন। মনের উৎকর্ষণেই তার সৃষ্টিযজ্ঞ আর সেই সৃষ্টিযজ্ঞের চেতনা আলোকেই কিষ্কিন্ধ্যার অপসারণ। তাহলে কী দেখা যাচ্ছে? না, মনের সাথে আর্থসমাজ সম্পর্কের যে রুট সেই রুট প্রযৌক্তিক মনের ক্রমোত্তরণে আর্থসমাজে বাস্তবায়িত হতে পারে উদবৃত্ত মূল্যের মৌচাক ন্যায় সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। যা আর্থসামাজিক ফান্ড বা সরকারি ভাণ্ডার। যে ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে আর্থসমাজ পেতে পারে ক্রম ব্যাপনশীল শ্রমক্ষেত্র। যেখানে সকলেই মৌমাছি বিশেষণে বিশেষিত হয়ে প্রয়োজন মতো বস্তু লক্ষ্যের বাস্তবতায় জীবনবস্তু ভোগ করতেও পারে। যে শান্তিপূর্ণ ভোগেই মেধা প্রতিভার জন্ম।

এই প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন, জল আগুনের বাস্তবানুগ ব্যবহার একদিকে যেমন জীবনদায়ী আবার বস্তু বিচ্ছিন্নতায় সে দুটির অবাস্তব ব্যবহার তেমন জীবনঘাতী। সৃষ্টির স্বার্থে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন অর্থ, কিন্তু অর্থের জন্য বেঁচে থাকা নয়। তাই মানুষকে প্রয়োজনের সীমার মধ্যেই থাকতে হয়। না হলে তার প্রয়োজনাতিরিক্তটাই হয়ে যায় তার নিজের বোঝা। প্রশ্ন ওঠে, মানুষের এই প্রয়োজনবাচক সীমারেখা কি টানা যায়? অতঃপর এই মর্মেই প্রাশ্নিককে ভোজের আসনে বসিয়ে দিয়ে দেখা যাক তার ভোজের প্রয়োজনানুগ সীমা থাকে কি না? হাঁ ভোজের এই সীমা প্রামাণ্যেই স্বতঃসিদ্ধ যে, সেই সীমারেখা টানতে না চাওয়া প্রাশ্নিকরাও আত্মপ্রতারক, তাদের বিশেষণে বিশেষিত হওয়া আর্থসমাজ চেতনাও

আত্মপ্রতারক। সেই প্রতারণায় নির্বাচিত নেতৃত্ব বা কেমন হয় আর সেই নেতৃত্বের প্রযুক্তিই বা কেমন হয়?

**শ্রমবিজ্ঞান ও আর্থসামাজিক বিকাশঃ**

মানব জীবনের লক্ষ্যগত আমিত্ব বিকাশনী বেঁচে থাকার স্বার্থে উৎপাদিত মূল্যকে বিভাজন করা এবং বিভাজনী বাস্তবতায় সেই মূল্যের বিকেন্দ্রীকরণ করার কথা, যা শ্রমেরই বিজ্ঞান। কিন্তু রক্ষণকামিতা? সে তো মূল্য সবসময় কুক্ষি করতে চায়। কারণ সে শ্রম বিজ্ঞানকে ভয় পায়। কেন? না, রক্ষণকামিতা চায় পরগাছামি দাপট। আমিত্ব চায় তার শান্তি ভোগবাচক সৃষ্টি বিকাশী শ্রমবিজ্ঞান। সুতরাং সেই শ্রমবিজ্ঞান অনুযায়ী শ্রমিকের আর্থসামাজিক শ্রমে উৎপাদিত যা কিছু তার উদবৃত্ত অংশ তা সেই বিকাশ খাতে ব্যয় করার কথা। আমিত্ব শাসনে দেহমনের উৎকর্ষ সাধনায় শ্রমিক ব্যক্তিকতা থেকে নৈর্ব্যক্তিকতায় অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক থেকে আত্মবিকেন্দ্রিক হলেই তার উদবৃত্ত মূল্য ব্যক্তি মালিকানা থেকে সামাজিক হেফাজতের রূপ পায়। সেই রূপায়ণেই উদবৃত্ত মূল্যের আমিত্ব প্রযৌক্তিক বস্তুভোগ। যে বস্তুভোগের আমিত্ব স্বাতন্ত্র্য নিগমই আর্থসামাজিক বিকাশ। যে বিকাশে আবশ্যিক মূল্য ও উদবৃত্ত মূল্যের অঙ্কটি হয় পরিষ্কার। নিযুক্ত হয় আর্থসমাজ শ্রমের মৌচাক বিশেষণী প্রযুক্তি। যে প্রযুক্তির রাজনৈতিক মুক্তায়নে শ্রমশোষণ জোঁকের সংক্রমণও হয় না, শ্রমিকের কোনো ভীতিও থাকে না। সেই সমাজে মেধার জন্ম হয় ও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা হয়। কিন্তু মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে পরগাছামি দাপটে আর্থসমাজ শ্রমের উদবৃত্ত মূল্য সহ শ্রমিকের আবশ্যিক মূল্য পুঁজির পেটে চলে যায়। উৎপাদক তার উৎপাদনের মূল্য পায় না। উৎপাদনে সবথেকে বেশি শ্রমিক কাজ করে কৃষিক্ষেত্রে। তাই পৃথিবীর যে কোনো জনপদে কৃষক সবথেকে বেশি শোষিত। কৃষক শস্য উৎপাদন করে তার সহায়ক মূল্য পাওয়া তো দূর, উৎপাদনের খরচটুকু পায় না। কেন না যে কোনো উৎপাদনের দাম নির্ধারণ করে পুঁজি এবং তা পণ্য করে বাজার জাত করে অনেক বেশি দামে। ভোক্তা যে দামে সেই পণ্য ক্রয় করে তাতে তার ব্যবহারিক মূল্য থাকে না। উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়েই শোষিত হয়। ক্ষমতা কৃষকদের ঋণ মকুব করলেও পুঁজির শোষণ বন্ধ হয় না। কৃষক-শ্রমিকের অবস্থা একই থেকে যায়।

**দর্শনঃ**

মানব জীবনের লক্ষ্যই আর্থসমাজ শ্রমের উদবৃত্ত মূল্যের বাস্তবানুগ বিন্যাসে সেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে উৎপাদনী শ্রম, শ্রমের মূল্যায়ন, মূল্যের বিভাজন ও উদবৃত্ত মূল্য নিয়ন্ত্রণী মনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতেই শ্রম শক্তির বিকাশ, চেতনার বিকাশ, মেধা-মানবতার বিকাশ। কেন না প্রক্রিয়াজাত সম্পদ, উৎপাদনী শ্রম ও উৎপাদন সম্পর্কের তত্ত্বাবধানগত নিয়ন্ত্রণী অর্থনীতি চেতনা বিকাশের সহায়ক। দ্বান্দ্বিকতায় দানবতা নিয়ন্ত্রণী মেধা-মানবতা বিকাশী যোগ্যতা অর্জনে চেতনার সাতটি স্তর অতিক্রমী আর্থসমাজ-মুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ দেখানোটিই দর্শন। দর্শন পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রায়োগিক প্রযুক্তির তত্ত্ব দেয়। উন্নততর চেতনা বা মার্গীয় চেতনা দর্শনের তত্ত্ব দেন। চেতনার সপ্ত সোপান — অচৈতন্য, চৈতন্য, দৃষ্টি, প্রেম, দ্বন্দ্ব, দহন ও মুক্তি। মুক্তি নিষ্ক্রান্তে সিংহাসনী অধিষ্ঠান।

**ভারতীয় দর্শন** — আর্থসামাজিক শ্রম দিয়ে শ্রমিক যে মূল্য উৎপাদন করে, সেই মূল্য বিভাজনে তার সত্তান্দরী অস্তি তারই সম্পৃক্তিক নাস্তিক্য বিঘ্নতায় তাকেই করে দেয় শুঁড়পাঞ্জার মূষিক সুড়ঙ্গে লক্ষ্মীছাড়া মানে বস্তুবিচ্ছিন্নতায় লক্ষ্যচ্যুত। অর্থাৎ উৎপাদিত মূল্যের বেহিসেবে মানুষ তার সুড়ঙ্গী মূষিক বিশেষণ ওভারকাম করতেও পারে না, বিশ্বকর্মারূপ প্রায়োগিক প্রযুক্তিতে তার শুঁড়পাঞ্জা রূপ আগ্রাসনী চরিত্রের পিঠে বসে তা নিয়ন্ত্রণ করতেও পারে না। আর্থসামাজিক বস্তু বিচ্ছিন্নতায় সে নিজেরই বস্তু লক্ষ্য থেকে ছিটকে পড়ে হয়ে যায় সেই শুঁড়পাঞ্জারই বাহন সুড়ঙ্গী মূষিক বিশেষিত। সেই শুঁড়পাঞ্জা রূপ আগ্রাসনী জড়ভুঁড়ি বহন করা পীড়ন থেকে উঠে সেই শুঁড়পাঞ্জারই পৃষ্ঠাসনী কর্মযজ্ঞের প্রযুক্তি বাস্তবতাই মানুষের বিশ্বকর্মারূপ বাসনার প্রাজ্ঞতা।

শ্রমমূল্যের ব্যক্তিকুক্ষি বিশেষিত ধনকে আর্থসামাজিক ফান্ডে মানে সম্পদে রূপান্তর করার প্রতীক মায়ের বাড়ি থেকে মাসির বাড়ি জগন্নাথী রথযাত্রা। যে যাত্রাতেই তৈরি হয় স্বর্গ। সেই সম্পদে প্রকল্প রূপায়ণে সেই সমাজে জ্ঞান বিজ্ঞান উৎকর্ষণী উন্নয়ন যা সকলের ঘরে ঘরে ফিরে আসে। যা প্রতীকী

উল্টো রথযাত্রা।

ব্যক্তিকুক্ষির আবর্জনা রূপ ধন মানে দুর্যোধনকে হারানোর সেই যোগ্যতা অর্জনেই সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। যোগ্যতা অর্জন বাচক অর্জুন হতে পারলে, উত্তরণী সংগ্রামের স্থিরতায় যুধিষ্ঠিরের সহযোগী হয়ে দুর্যোধনকে হারিয়ে চেতনার সাত স্তর অতিক্রান্তে অষ্টম গর্ভীয় (জন্মাষ্টমী) 'শ্রী' বাচক যোগ্যতায় আর্থসামাজিক স্বর্গ রচনা করতে পারে। যা মানবতার প্রতীক পাণ্ডবদের সশরীরে স্বর্গারোহণ। যে স্বর্গে দানবতার পক্ষ নেওয়া দুর্যোধন সহ কৌরবরাও থাকে, কারণ দুর্যোধন তখন ব্যক্তিকুক্ষির ধন নয়, তা তখন সেই সমাজের বিকাশেয় লক্ষ্মীর ভাঁড় যা সকলের ভোগ্য সম্পদ। পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রতীক লক্ষ্মী। তাই নেতৃত্বকে হতে হয় ধর্মরাজ। অর্থাৎ যিনি ধর্মের নেতা, তিনিই রাজনীতির নেতা। পুরাণের পূর্ণত্ব মহাভারতে, যেখানে দেখানো হয়েছে ব্যক্তি ও আর্থসমাজ চেতনার নিম্নতম থেকে উর্ধ্বতম পর্যন্ত সপ্ত সোপান বিশ্লেষণে বস্তু বর্তনী ক্ষমতালাভের রণকৌশল। যে সপ্ত সোপান অতিক্রান্তে মুক্তি ও মুক্তি প্রতিষ্ঠায় কাল পাত্র ক্ষেত্রিক আর্থসমাজ বর্তনী সংস্কৃতির রাজনৈতিক বাস্তবায়নই 'আমি'র অধিষ্ঠান বাচক শ্রীবাস্তব জন্মাষ্টমী। মহাভারত প্রদর্শিত চিরায়ত তত্ত্বেই আর্থসমাজ-মুক্তি ঘটিয়ে সেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

**বৌদ্ধ দর্শন** — সেই লক্ষ্যেই গৌতম বুদ্ধের প্রীত্যর্থীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ 'তোমাদের অবাঞ্ছিত যা কিছু সব ছেঁটে ফেল।' মানে তুমি বস্তু নির্ভর হও। জড় সর্বস্ব রক্ষণকামী জড়ভোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনাশক্তি বৌদ্ধ প্রভাবনী চার আর্য সত্ত্ব — দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিবারণের উপায় আছে, দুঃখের নিবারণ আছে। যা নির্বাণ বাচক আর্য সত্ত্বের পূর্ণচ্ছেদ। কিন্তু যা সত্তা থেকে 'আমি'র নিষ্কৃতিক সত্য তা অনন্ত। অর্থাৎ নির্বাণ বাচক আর্য সত্ত্বের পূর্ণচ্ছেদ ঘটানোই বস্তুগামী সভ্যতার ভোক্তা পুরুষ-বিবর্তনী আমিত্বিক দেহাঙ্গনী মানব সদন প্রকৃতির বিধেয় প্রবৃত্তি ভব্যতা। আর এই ভব্যতাই তার নিষ্কৃতি বাচক বিসর্গিক দেহমনের প্রতিপাদনী ত্রি-শরণ — বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি — আমি গমন করছি বুদ্ধ অর্থাৎ বোধির শরণে, ধর্মের শরণে, সংঘের শরণে। বৌদ্ধ দর্শনে চেতনার সাত স্তর অতিক্রান্তে 'আমি'র অধিষ্ঠানকে অষ্ট অনাঙ্গিক মার্গ বলা হয়েছে। অর্থাৎ অষ্ট অনাঙ্গিক মার্গ এবং জন্মাষ্টমী তত্ত্ব একই।

**ইসলাম** — মানুষ জন্মগতভাবেই পদার্থিক কালাঙ্গনী অর্থাৎ প্রকৃতি নিয়মের মধ্যে কালবন্দি আকৃতিক। কালবন্দিত্ব থেকে মুক্তি ঘটিয়ে 'আমি'র অধিষ্ঠান মুহাম্মদিয় স্বরূপে। যে কালবন্দিত্ব থেকে মুক্তির জন্যই ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তির পঞ্চ কৃৎকলা —

১। **কালেমা** — আমিত্ব জাগরণ। যে জাগরণেই উৎপাদনী শ্রম, শ্রমের মূল্যায়ন, মূল্যের বিভাজন ও উদবৃত্ত মূল্যের বিন্যাস। অর্থাৎ কালেমা আর্থসমাজ জীবনে প্রয়োগ হলে সিয়াম, হজ্ব, জাকাত ও সলাতের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

২। **সিয়াম (রোজা)** — আমিত্ব শাসনে মানব দেহমনের উৎকর্ষসাধনী প্রকৌশলের অন্যতম কৃৎকলা। যে উৎকর্ষ সাধনেই ব্যক্তি তার উদবৃত্ত মূল্য মানে জাকাত আর্থসামাজিকীকরণ করতে পারে।

৩। **জাকাত** — আমিত্বখালাসগত আর্থসামাজিক শ্রমমূল্য। যা ব্যক্তির প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সলাত কায়েমের এষণাতেই জাকাত কুক্ষি থেকে বাহির হয়ে মানবতার বিকাশ প্রযৌক্তিক বায়তুল ফান্ডে জমা হয়ে যায়। মানব কল্যাণে আর্থসমাজ বিকাশী যে বায়তুল ফান্ডের হেফাজতকারী ট্রাস্টই নির্বাচিত ক্ষমতা প্রায়োগিক মৌচাক তত্ত্বের অর্থনৈতিক

প্রতিনিধিত্ব প্রযুক্তি। যাতে ব্যক্তিকুক্ষির ইঁদুর দৌড়ে শ্রমমূল্য নিয়ে লুকোচুরি করার আর কোনো অপসুযোগই রক্ষ মানস পেতে পারে না। সেই বায়তুল ফান্ড দিয়েই রূপায়িত হয় নতুন নতুন প্রকল্প, শ্রমশক্তি পায় উদবৃত্ত মূল্য বিনিয়োগের শ্রমক্ষেত্র। যে শ্রমক্ষেত্র আর্থসমাজ মানবতার সমৃদ্ধিতে সমশ্রুবান সমবায় সংস্থা। মানব কল্যাণী যে সংস্থার বস্তু বর্তনে সেই মৌচাক বিশেষিত অর্থনীতির কাল পাত্র ক্ষেত্রানুগ আর্থসমাজ প্রযৌক্তিক নেতৃত্বই ইমামতি, আর সেই প্রযুক্তির প্রযোক্তাই ইমাম।

৪। **হজ্ব** — বিশ্ব মানবতার আর্থসমাজ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সমগ্র বিশ্ব থেকে জাকাত এবং হজ্বের জমায়েতে কোরবানিসহ যে অর্থ কালেকটেড হয় সেই কালেকটেড মূল্যের বিকেন্দ্রিকরণ। অর্থাৎ যে যে জনপদে মেধা-মানবতা বিকাশনের প্রকল্প রূপায়ণে যে ঘাটতি থাকে সেই সেই জনপদকে সেই ঘাটতি সম্পূরক অর্থ দেওয়া। বিশ্ব-আর্থসামাজিক সম্প্রসারণে যে সম্পূরণ প্রযুক্তি সেই জনপদী সমস্যার সমাধানে পূর্তিবাচক। যে সম্পূরণী পূর্তিতে ভিক্ষাবৃত্তি আর দাতব্যগিরি দুটোই নিপাত যায়।

৫। **সলাত কায়েম** — সল অর্থে আত্মা বা আমিত্ব বা আপেক্ষিক বস্তু এবং কায়েম অর্থে ব্যক্তির ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিতি, আর্থসমাজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতি। অর্থাৎ অধিষ্ঠিত হোক মানুষের আমিত্ব আর প্রতিষ্ঠিত হোক শ্রমক্ষেত্রায়ন, শ্রমমূল্য নির্ধারণ, শ্রমমূল্যের বিভাজন ও মূল্য বণ্টনে বস্তু সচেতন আর্থসমাজ। যে প্রতিষ্ঠায় আর্থসামাজিক উদবৃত্ত মূল্য অর্থাৎ জাকাত প্রায়োগিক ক্রম ব্যাপনশীল শ্রম ক্ষেত্রায়নই সলাত কায়েম। যে সলাত কায়েমি শান্তি বাস্তবতা সুন্নত গঠনী ব্যক্তিত্ব প্রযৌক্তিক ফরজিয়া ইমামতিতে অর্থাৎ আর্থসমাজ রাজনৈতিক নেতৃত্বে।

**সলাত অনুষ্ঠান** — চেতনার মেধা কর্ষণেই মনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি। সেই উৎকর্ষণেই আর্থসামাজিক বস্তু লক্ষ্যের ঐক্যবাচক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন। যা সলাত কায়েমের সহযোগী। সেই কায়েমবাচক বস্তু লক্ষ্যের ঐক্যেই ফরজ আর নিজেকে ঐ ঐক্যের সহযোগী করে তোলাই সুন্নত। যেহেতু নাস্তি নিসর্গে সম্পৃক্ত অস্তি বিসর্গিক মানবদেহ থেকেই সেই সম্পৃক্তি বিশেষণে মন দ্বন্দ্ব উদগত, সেহেতু দেহ ঠিক না থাকলে মনের উৎকর্ষতা বাড়ে না, তাই আর্থসমাজ পূর্ণাঙ্গিক জীবন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক স্রষ্টা পূর্ণাঙ্গ মানব চরিত্র হজরত মহম্মদ(সঃ) ব্যায়াম বলিষ্ঠতা সহযোগে সলাতের অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। এই জন্যই সলাতের অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া মহাভাষ্যে উল্লেখ নেই। পূর্বেই উল্লেখিত যে, যে কোনো পরিকল্পনার ঘটনা মনেই আগে ঘটে যায় পরে ঘটনাস্থলে তার অনুষ্ঠান হয়। অর্থাৎ সলাত কায়েম হলে তবেই সলাতের অনুষ্ঠান মাধ্যমে নিজেকে মহাবিশ্বের নিয়মে নিয়মানুগ করা যায়।

**মার্কসিয় দর্শন** — ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি অকেজো হওয়ার দীর্ঘ হাজার বছর পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপিয় শিল্প বিপ্লবের ফলে যে উদবৃত্ত মূল্যের উৎপাদন হয়েছিল তার বাস্তবানুগ প্রয়োগের জন্য আয়াস সাপেক্ষ পশ্চিমা জীবন আর্থসামাজিক মূল্যের হিসেব কষেছে। আর এইভাবেই হিসেব কষতে কষতে এগিয়েছেন হেগেল, লুদভিখ ফয়েরবাখ, প্রুঁধো প্রমুখ। আর তাঁদের সূত্র ধরেই মার্কস-এঙ্গেলস শ্রম তথা উদবৃত্ত মূল্যের কানা গলিটা পেয়ে গেছেন। নৈর্ব্যক্তিকতার অবস্থান থেকে ঐতিহাসিক মানব চরিত্র কার্ল মার্কস বিশ্লেষণ করেছেন শ্রম মূল্যায়নগত মনের আর্থসমাজ সম্পর্কের রুট। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি যাওয়ার আগেই মার্কস লক্ষ্য করলেন মানুষের দেহমন উদবৃত্ত মূল্য উৎপাদন করে। নিজেকেই প্রশ্ন

করলেন এই উদবৃত্ত মূল্যের মালিকানা কার, আর্থসমাজ সত্তার দুয়ারে কড়া নেড়ে বললেন ঐ উদবৃত্ত মূল্যের মালিকানা আর্থসমাজের, একজন শ্রমিক শ্রম দেবে তাঁর মেধা অনুযায়ী আর আবশ্যিক মূল্য নেবে তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী। মানব সভ্যতাকে উপহার দিলেন 'দ্যস ক্যাপিটাল'।

**ধর্মঃ**

দর্শনের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস এই ছয়টি বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়। সেই উপলব্ধ তত্ত্বের ফলিত প্রয়োগে নেতৃত্বকে দ্বান্দ্বিক হতেই হয়। অর্থাৎ নেতৃত্বকে উন্নত চেতনিক মানে দর্শন প্রযৌক্তিক অনুভূতির পাঠক হতে হয়। আর্থসমাজ-মুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেই দর্শন-তত্ত্বের রাজনৈতিক প্রয়োগটিই ধর্ম। উন্নত চেতনা ধর্ম পরিচালনা করেন এবং ধর্ম চর্চা মানুষকে তার সত্তা থেকে আমিত্বের নিষ্ক্রমণ ঘটায়। মনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে ব্যক্তিকতা থেকে নৈর্ব্যক্তিকতায় সেই সমাজকে সমষ্টিতে নিয়ে যেতে হয়। মানুষের জিন হারমোনাইজড হয়, মহাবিশ্ব প্রকৃতির শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত সমাজ-মানসের শান্তিভোগ বেড়ে যায়। ধর্ম পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রায়োগিক কাল পাত্র ক্ষেত্রিক প্রযুক্তি নির্মাণ করে। যেখানে কোনো মডেল তৈরি হয় না। সেই লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দর্শন-প্রযৌক্তিক চিন্তা ভাবনায় সেই সমাজ-মানস গঠন করতে হয়।

মহাভারতে এই সমষ্টিরই প্রতীক পাণ্ডব যারা কৌরব সহ সকলকে নিয়ে চলে। মানবতার পক্ষে উন্মুক্ত চেতনার পাণ্ডববর্গ সংখ্যালঘু হলেও সংখ্যাগুরু আবৃত চেতনার কৌরবদের হারিয়ে আর্থসমাজ-মুক্তি ঘটিয়ে সেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। তাই কৌরব থেকে পাণ্ডবে উত্তীর্ণ হতে হয় মানে নেতৃত্বকে ব্যক্তিকতা বর্জন করে নৈর্ব্যক্তিকতায় উন্নীত হতে হয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে দুর্যোধনকে হারিয়ে মানে উদবৃত্ত মূল্যের বিন্যাসে আর্থসামাজিক স্বর্গ রচনা করতে হয়। চিরায়ত তত্ত্ব মহাভারতের রাজনৈতিক প্রয়োগ এই জনপদে হয়নি।

ব্যক্তি তথা আর্থসমাজ মুক্তির মহানায়ক মহামানব হজরত মুহাম্মদ(সঃ) এর নেতৃত্বে ৬৩০-এ মক্কাবিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনা ইসলামের আর্থসামাজিক প্রযুক্তি প্রয়োগেরই বাস্তবতা। যে বাস্তবতাতেই সেই সমাজ মুক্তির বস্তুভোগ মানব আরূপ মণ্ডলী করেছিল। কুফর বা আবৃত চেতনার উন্মোচনে মহাবিশ্ব সংবিধানের গবেষণা ও তার প্রয়োগে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাও হয়েছিল। হজ্ব-এর বাস্তবায়ন অর্থাৎ বিশ্ব মানবতার আর্থসামাজিক সম্প্রসারণে বিভিন্ন ভূখণ্ডের বাউন্ডারি উঠেও গিয়েছিল। মহাবস্তু প্রত্যয়িত অনাপেক্ষিক ইসলামের প্রযুক্তি প্রয়োগে মানুষ সীমা থেকে অসীমের দিকেও এগিয়েছিল, বৃন্দাবনী আর্থসমাজ তৈরি হয়েছিল। এই প্রযুক্তি প্রয়োগেই মেধা -মানবতার বিকাশ ঘটেছিল বলেই জ্ঞান চর্চায় আরব জনপদগুলো ৪০০ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেছে।

অতঃপর আত্মপ্রতারণী পৈতৃক ক্ষমতার হাতে অকেজো হয়ে যাওয়া ইসলামের মৌচাক তত্ত্ব প্রযুক্তি ঐতিহাসিক কমিউনিজমের হাতে হাত মেলানো অভিযোজনার বাস্তবতায় মানুষ দীর্ঘায়িত বস্তুত্বের ভোগ সন্ধান পেল ও ভোগ করল। আর্থসমাজ-মুক্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ গ্যাপের পর রাশিয়ায় লেনিনের মত প্রযোক্তার হাতে মার্কসিয় দর্শনের রাজনৈতিক প্রয়োগে নন্দনকাননের সূচনায় সোভিয়েত গঠন হয়েছিল। লেনিনীয় ব্রহ্ম বৈবর্ত আর্থসমাজ সম্প্রসারণে অনেক ভূখণ্ডে বাউন্ডারি উঠেছিল। অখণ্ড জীবনবোধে ক্ষুদ্র জনপদ থেকে বৃহত্তর সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনও হয়েছিল। আর ক্ষুদ্রতম গণ্ডী পেরিয়ে গণ্ডীবিহীন ধ্রুব লক্ষ্যগত বৃহত্তর জীবন বস্তুত্বে বিবর্তিত হয়ে এগিয়ে যাওয়াটিই সোভিয়েত তত্ত্ব। যা স্টেটলেস সোসাইটির বাস্তব উদাহরণ। কার্ল মার্কস ধর্মের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে জনকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে, আদর্শ নির্মাণের ক্ষেত্রে ধর্মের তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

অর্থাৎ ধর্ম আর রাজনীতি মানুষের পিঠ ও পেটের ন্যায়। ধর্ম ধনকে সম্পদে রূপ দিয়ে আর্থসামাজিক ফান্ড গঠন করে আর রাজনীতি সেই ফান্ডে প্রকল্প রূপায়ণে সেই সমাজের বিকাশ ঘটায়। অর্থাৎ ধর্ম ছাড়া রাজনীতি হয় না, আর রাজনীতি ছাড়া ধর্ম হয় না। কিন্তু ধর্ম যদি প্রথা পালনী আনুষ্ঠানিকতায় আটকে যায় তাহলে রাজনীতি তার বৈতরণী পার করতে হালে পানি পায় না। অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণহীনতায় সেই সমাজে সকলের ভোগ্য সম্পদ পুঁজির পেটে চলে যায়, যা

গণেশী মানে মুক্ত বাজার অর্থনীতি। তাতে মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়।

অতঃপর ২০/১২/১৯৯১-তে ক্রেমলিন থেকে নেমে গেল শ্রমিকের ধ্রুবলক্ষ্য প্রতীক লাল ঝাণ্ডা, কমিউনিজমের আর্থসামাজিক প্রযুক্তিও অকেজো করে দিল। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে মানুষ হয়ে গেল দিশেহারা। গণের তান্ত্রিকতায় মেধার বনবাস বা কারাবন্দি আর প্রথা পালনী ধর্মে দর্শন-প্রযুক্তিহীনতায় মানুষ মুক্তির পথ-প্রযুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না।

**প্রথা পালনঃ**

আর্থসামাজিক মুক্তিতে দর্শনের তত্ত্ব প্রায়োগিক ধর্ম মানুষকে একত্রিত করে। ধীরে ধীরে সেই সমাজ দ্বন্দ্বহীন হয়ে পড়লে সেই দর্শনের অনুসারীরা একত্রিত হয়, মডেলে রূপ নেয়, কিন্তু তা সমাজবোধহীন শক্তি। ধর্মের নামে তাদের একত্রিত হওয়াটা আর্থসামাজিক মুক্তির জন্য নয়, এই পৃথিবীকে স্বর্গ বানানোর জন্য নয়, তা তাদের কথিত মৃত্যু পরবর্তী স্বর্গ(!) লাভের জন্য। প্রথা পালনে মনের নিয়ন্ত্রণ হয় না, উদবৃত্ত মূল্য বিন্যাসী প্রযুক্তিও প্রয়োগ করতে পারে না। পরোক্ষে তারা শোষকের হয়ে কাজ করে। তাই পুঁজির প্রথম আক্রমণ থাকে দর্শনের তত্ত্বকে তথ্যরূপে বিকৃত করা। সেই সমাজকে দ্বন্দ্বহীন করে সমাজ-মানসকে নানা অপঘটনার পেছনে ছোটানো। সেই সমাজ-মানস দ্বন্দ্বহীন হলে অবচেতনে সে প্রথা পালনী ধর্ম(!) মানে গাঁজার কলকী ধরে নেয়। তাই ঋষির সাবধানতা, মানুষ তুমি জেগে থাকো মানে দ্বান্দ্বিক হও, ঘুমিয়ে গেলে তোমার দানবতা তোমারই মানবতার উপর চেপে দাপা দাপি করে। রক্ষের কাজ ধর্মকে প্রথা পালনী আচার অনুষ্ঠানে ঢুকিয়ে দেওয়া। যাতে সে ছদ্মবেশে ধর্মের নামে শোষণ চালিয়ে যেতে পারে। সেই সমাজের সীতা মানে শান্তি সে ছদ্মবেশেই হরণ করে।

গৌতম বুদ্ধের প্রীত্যর্থীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ 'তোমাদের অবাঞ্ছিত যা কিছু সব ছেঁটে ফেল।' সেই নির্দেশে তাঁর প্রীত্যর্থীরা মাথার চুল ছেঁটে ফেললে কি তাদের অবাঞ্ছিত ছাঁটা হয়? না বাৎসরিক কোনো অনুষ্ঠানে জবড়জং ধারণা ধরা মস্তক থেকে তা ছাঁটাই করা মস্তক মুণ্ডন তত্ত্বের প্রয়োগে মাথা ন্যাড়া করলে ধনাবর্জনার সংক্রমণ থেকে মানুষ রেহাই পায়, না তার সংক্রমণী জবড়জং ধারণার বোঝা তার মাথা থেকে নেমে যায়? বুদ্ধের নির্দেশে অবাঞ্ছিত ছেঁটে ফেলতে যারা বাঞ্ছা অবাঞ্ছার তফাৎ করতে পারেনি, তারা অঙ্গ অনঙ্গের তফাৎ করতে না পেরে অষ্ট অনাঙ্গিক মার্গকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ আর চার আর্য সত্ত্বকে চার আর্য সত্য করে দিয়েছে।

হজরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর পূর্ববর্তীদের ক্ষমতা দখলের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। ক্ষমতা দখলের প্রসঙ্গ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বিধান আলকোরান-এর পর। তাঁর নেতৃত্বে এই জ্ঞানের রাজনৈতিক প্রয়োগেই, আর্থসমাজ পূর্ণাঙ্গিক জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু ঐতিহাসিক ইসলামের চার খলিফার পর স্বঘোষিত খলিফা হয়ে মোয়াবিয়া যে পৈতৃক ক্ষমতার বিষ বীজ পুঁতেছিল, কাল পাত্র ক্ষেত্রিক প্রজ্ঞার অভাবে ইসলামের ঐতিহাসিক অতীত-আরব কেন্দ্রিক চেতনা সেই ক্ষমতা রীতি উপড়ে ফেলতে পারেনি। বরং মোয়াবিয়া থেকে ক্ষমতা পেয়ে ইয়াজিদ কারবালায় নৃশংস ঘটনা ঘটিয়ে পাকাপাকি ভাবেই সেই রীতির ফ্ল্যাগ উত্তোলন করেছিল। যাতে আর্থসমাজ-সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রকৌশলী কৃৎকলা শাশ্বত ইসলাম প্রথা পালনী ধর্ম(!) রূপে বন্দি হয়ে গেল পৈতৃক ক্ষমতার বিষ বীজ ইন্ধনী অতীতচারিতায়। প্রথা পালনী মানব চেতনা হয়ে গেল রক্ষ ইন্ধনী ধারণাবদ্ধতায় আচ্ছাদিত। যে আচ্ছাদনে সমাজবোধও তাদের শক্তিহীন। দিনে পাঁচবার কল্যাণের জন্য আহ্বান করেও সেখানে থাকে না তাদের মানব কল্যাণী কোনো কর্মসূচি। অতীতচারিতার হেঁয়ালিতে বর্তমানকে বাস্তবানুগ করতে না পেরে, ইয়াজুজ-মাজুজী জাহেলিয়ানায় অশান্তির পীড়নে সেই আচ্ছাদিতরা পীড়িত হতে থাকল। ইসলামের ঐতিহাসিক আবির্ভাব অনুষ্ঠান করার অধিকার(!) আদায়ের জন্য নয়, তা আর্থসমাজ-সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রয়োগে সলাত কায়েমের প্রযুক্তিকে আমিত্বের শান্তি ভোগবাচক প্রয়োগ করার জন্য।

ঐতিহাসিক কমিউনিজমের বাস্তবতা কি রক্ষ ইন্ধনী আত্মপ্রতরণায় নাস্তিক আর নাস্তিক্যবাদ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, না অস্বীকার করা যায়? কোন সন্তুষ্টিতে মহাস্রষ্টা কাদের পছন্দ করলেন? সেই ধার্মিক(!) কথিত আস্তিককে না নাস্তিককে? হ্যাঁ এই প্রশ্নটিরই বস্তু জবানিকা হল প্রযৌক্তিক সাহিত্য শিল্পের সাফল্য। যে সাফল্যে মার্কস অভিব্যক্ত অনুভূতির পাঠক লেনিন, হো -চি-মিন প্রমুখের ঐতিহাসিক বস্তু বিজয়। তাঁরা যদি

বস্তু বিচ্ছিন্ন আত্মপাণ্ডিত্যের ডেঁপোমিতে মার্কসকে নির্বাসন দিতেন, অথবা কূপমণ্ডূকী আগ্রাসনে সারাজীবন ধরে মার্কসের গুণগান করতেন, দ্যস ক্যাপিটালের খতম বক্সাতেন, তবে কি তা বস্তু গ্রাহ্য হত, না সেই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করা যেত? আর তারপর রুশ বিপ্লবের ইতিহাস তো এখন রক্ষ প্রভুদেরও জানা!

প্রতি অর্থে ন্যায়, তুলনীয়, সদৃশ আর মা অর্থে তত্ত্ব, জ্ঞান, শক্তি। মানুষেরই রক্ষণকামিতা দর্শন-তত্ত্বকে তথ্য করা প্রতিমা খাড়া করে। প্রতিমা দুই ধরনের — আকার প্রতিমা আর আচার প্রতিমা। প্রতিমা (নির্দিষ্ট মডেল) খাড়া করা মানেই সেই সমাজে দর্শন-তত্ত্ব প্রযুক্তি প্রয়োগ না হওয়া।

দর্শনের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে যদি সেই ছয়টি বিষয়ে পারদর্শিতা না থাকে, নিম্ন চেতনার প্রযোক্তা দর্শন-তত্ত্ব বুঝতে পারে না, আর্থসমাজ জীবনে তা প্রয়োগ করতেও পারে না। শুধু মুখস্থ করে আবৃতি করে। যা দর্শন-তত্ত্বকে গিলে খাওয়া। আর গিলে খেলে কী হয় তা প্রকৃতির দিকে তাকালেই দেখা যায়। গিলে খাওয়া জন্তুরা হয় হিংস্র। তেমনি ধর্মের নামে দর্শন-তত্ত্ব গিলে খাওয়া প্রথা পালনীরাও হয় হিংস্র। চলতে থাকে প্রথা পালনী আনুষ্ঠানিকতা। নির্দিষ্ট মডেলে ঢুকে যায়, তৈরি হয় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম(!), যা সেন্টিমেন্ট ছাড়া কিছুই নয়। অবাঞ্ছিত সেন্টিমেন্টের গণ্ডিবদ্ধতায় জিন উসকে তারা হয়ে যায় হঠকারি, দাঙ্গাবাজ, আত্মঘাতী। সেন্টিমেন্ট্যাল বিভাজনে বাড়তে থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম (!)। রক্ষ লড়াই লাগিয়ে দেয় ধর্মীয় এক সেন্টিমেন্টের সাথে অন্য সেন্টিমেন্টের, তৈরি করে জাতপাত, রেসিয়াল,...। সমাজকে টুকরো টুকরো করে দেয় যাতে তারা ধর্মের পথে একত্রিত হতে না পারে, তাই সে প্রচার করে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধারণাবদ্ধতায় আচ্ছাদিত ধৃতরাষ্ট্রিক অন্ধত্বে পরকালকে ধরে নেয় মৃত্যু পরবর্তী কাল। মৃত্যু পরবর্তী স্বর্গ লাভের মোহে প্রথা পালন করে। লক্ষ্য বাচক দিশা দেখতে না পেয়ে অতিন্দ্রীয়তায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে হেঁয়ালি করে। চেতনা বর্তমানে থাকে না, পাঁচ জনের সাথে বসে কথা বললে আলোচনার বিষয়বস্তু থাকে অতীত নিয়ে। অতীতচারিতায় বর্তমানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে না, লক্ষ্য বাচক কোনো সমস্যার সমাধানও হয় না। সমস্যায় জর্জরিত হয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে ছোটাছুটি করে। নিজের প্রতি বিশ্বাস মানে ইমান থাকে না, মানবিক শক্তি কমে যায়। তাদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানে ঐশ্বরিক শক্তি তাদের নাগালের বাইরে মানে উপরে আকাশে চলে যায়। তাই তারা সবকিছু উপরওয়ালার উপর ছেড়ে দেয়। কেন না তারা মানুষ তথা আর্থসমাজ, উৎপাদনী শ্রম, ফসলের / উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, মূল্যের বিভাজন, সামাজিক বিকাশ এসবের মধ্যে ঈশ্বরকে ভাবতে পারে না। তাদের ধারণা শুধু প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কথা ভাবতে হয়, ধার্মিক(!) হতে হয়। চেতনা বর্তমানে না থাকায় তারা বাস্তবতায় থাকে না, যুক্তি নির্ভর হতে পারে না। ধারণাবদ্ধতায় সমাজকে দ্বন্দ্বহীন করে প্রথা পালন বাড়িয়ে দিতে পুঁজি লগ্নি করে। যেমন বিংশের ষাটের দশকে রক্ষ রুশ জনপদে রাতের অন্ধকারে চাকতি উড়িয়ে প্রচার করত এসব উপরওয়ালার লীলাখেলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে লেনিনের মূর্তি তৈরি করে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় তার প্রতিনিধিকে দিয়ে মূর্তিতে ফুল দেওয়া প্রথা পালন সংক্রমণ করাত আর সে প্রচার করত তাতে পরীক্ষার ফল ভালো হবে। মানুষকে একবার ধারণাবদ্ধ করে দিতে পারলেই পুঁজির কেল্লাফতে। কেন না প্রথা পালনে একবার ঢুকে গেলে সেখান থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। প্রথা পালনের নেতৃত্বে যিনি থাকেন তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না, এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিধারীরাও তার নির্দেশে প্রথা পালন করে। কেউই দর্শন-তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করে না, তা নিয়ে ভাবে না, গবেষণা করে না, আর্থসমাজে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে না, সহজ সরল পথ নির্মাণ করতেও পারে না। দর্শন-তত্ত্ব না পড়ে, না বুঝে শুধু ধারণাবদ্ধদের কাছে শুনে শুনে তারা তাতে সংক্রামিত হয়। উন্নত চেতনাকে প্রথা পালনে সংক্রামিত করে, না হলে বাধ্য করে। প্রথা পালনে, নিয়ম শৃঙ্খলা নীতি-আদর্শ উপেক্ষিত হয়। কোনো দিশারী দর্শন-তত্ত্ব বোঝালেও তারা তা জানতে বুঝতে চায় না, উল্টে গান্ধারীর ঠুলি পরা অন্ধত্বে তারা সেই দিশারীকেই আক্রমণ করে, অভিশাপ দেয়।

যে কোনো পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়িত করতে ভাবতে হয়। চিন্তা ভাবনা ছাড়া উপলব্ধি করার ক্ষমতা বাড়ে না, কোনো কিছুরই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অথচ যে দর্শনে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার উল্লেখ, সেই দর্শনকে দ্বন্দ্বহীনরা ভাববাদী দর্শন বলে উড়িয়ে দেয়। অনুভূতির

অনুবাদ করতে না পেরে রক্ষ বস্তুকে পদার্থে গুলিয়ে দিয়ে গিলিয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে জানা প্রয়োজন, বস্তুভোগে উপজাত হিসেবে তৈরি হয় পদার্থ। আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি না জেনে কেউ ধর্মস্থানে গিয়ে প্রথা পালন করে নিজেকে ধার্মিক(!) বা আস্তিক (!) বলে, অন্যদিকে সেই প্রথা পালনকে ধর্মের স্বীকৃতি দিয়ে অন্যরা নিজেকে নাস্তিক(!) বলে। ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সেন্টিমেন্টের প্রথা পালনী আনুষ্ঠানিকতাকে কার্ল মার্কস নেশার সাথে তুলনা করেছেন। কেন না জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা করা থেকে গাঁজার কলকী ধরে নেওয়া অত্যন্ত সহজ। আর এই জন্যই রক্ষ অন্যান্য দর্শনকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের(!) মোড়কে নির্দিষ্ট মডেল (প্রতিমা) করে দিলেও মার্কসিয় দর্শনকে তা করতে পারেনি। তবে রক্ষ এর বিপরীতে যে কাজটা করেছে তা হল আত্মার কথা শুনে আঁতকে ওঠা আর ধর্মাতঙ্ক তৈরি করা। যেখানে ধর্ম নেই সেখানে দ্বন্দ্ব নেই, সেই প্রথা পালনী সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অভাব।

**মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও গণতন্ত্রঃ**

রক্ষণকামিতা যখন ইউরোপ তথা গোটা পাশ্চাত্যে চরম রক্ত পিপাসু হয়ে উঠল, তখন সেই রক্ত পিপাসা নিরসন করতে চাওয়া খ্রিস্টীয় দর্শন অর্থাৎ মুক্তি দর্শন বাহক যিশু তার হাতে লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টীয় বাণীতে বিবেকের কাছে হার মানা তারই পুনর্চক্রান্তে সেই দর্শন ত্রিত্ববাদ রূপে হয়ে গেল তার বিশ্ব দখল করা অস্ত্র। দুর্যোধনী ধনাবর্জনা দিয়ে চলে যেমন ভোট কেনা তেমনি সেই ধনাবর্জনারূপ পুঁজির বাজার দখলি লড়াই। যে পুঁজি লগ্নির জন্যেই বেনিয়া ইঁদুর খাল কেটেছিল উপমহাদেশে। শোষণ আর শাসনের জন্য ভৌগোলিক আগ্রাসনে গড়ে উঠেছিল উপনিবেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আর ভৌগোলিক আগ্রাসনের দরকার হয় না, বিশ্বায়নের নামে অর্থনৈতিক আগ্রাসনে চলতে থাকল তার শোষণ আর শাসন। উপনিবেশের রূপটা বদলে হল নয়া উপনিবেশ। শুরু হল উপনিবেশ আর নয়া উপনিবেশের সংক্রামিত করা পাশ্চাত্য তন্ত্র প্রয়োগের লড়াই। এই পশ্চিমা তন্ত্রও গণতন্ত্র। যার প্রয়োগে গোটা পৃথিবীটাই সেই নয়া উপনিবেশিকরা তাদের দখলে নিয়ে মানুষের শ্রমার্জিত মূল্য ইঁদুরের গর্ত দিয়ে তাদেরই ঘরে ঢুকিয়ে নিতে চায়। তাই সেই তন্ত্রের এত নয়া নয়া চিকন রূপ। চিকন রূপটা মাঝে মধ্যে গণতন্ত্র বলে গর্জেও ওঠে।

গণতন্ত্রে দলীয় অথবা নির্দলীয় নীতি বিশেষিত আসন প্রতিনিধিত্ব বাচক ব্যক্তিত্ব সমর্থনে শুধু বয়সের যোগ্যতায় মানুষের মাথা প্রতি ভোট। সৎ ব্যক্তির এক ভোট অসৎ-এরও এক ভোট, সেই অসততা সংক্রামিত সমস্যার যিনি বিচারক তাঁরও এক ভোট, জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর এক ভোট মাতাল-মোটাবুদ্ধিরও এক ভোট, শ্রমজীবির এক ভোট ভিখারীরও এক ভোট, ইত্যাদি। অর্থাৎ গণের এক ভোট জনের এক ভোট রণেরও এক ভোট যা বস্তুর স্বীকৃতিতে প্রশ্নবাচক। এই নির্বাচন প্রযুক্তির তালিকাভুক্ত ভোটার অনুপাতে পোলড ভোট ও বিজয় ভোটের ডিসব্যালান্সড ব্যবধানটিও বস্তুর স্বীকৃতিতে প্রশ্নবাচক। যেমন এই জনপদে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩১% ভোট পেয়ে জয়ী ২৮২টি আসনে, কংগ্রেস ১৯.৩% ভোট পেয়ে জয়ী ৪৪টি আসনে, এআইএডিএমকে ৩.৩% ভোট পেয়ে জয়ী ৩৭টি আসনে, তৃণমূল কংগ্রেস ৩.৮% ভোট পেয়ে জয়ী ৩৪টি আসনে, বিজেডি ১.৭% ভোট পেয়ে জয়ী ২০টি আসনে, যেখানে সিপিআই(এম) ৩.২% ভোট পেয়ে জয়ী মাত্র ৯টি আসনে। এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত ডিসব্যালান্সড জন প্রতিনিধিত্ব, জনপদী অখণ্ডত্বকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়।

গতানুবর্তিক গয়ংগচ্ছতায় মানুষ এইসব প্রশ্ন তোলার কথা ভাবতে চায় না। এই প্রযুক্তি বিশেষিত আর্থসমাজে চিকিৎসার জন্য সে কোনো কোয়ালিফায়েড ডাক্তারকে যে মূল্য দিয়ে থাকে তা কখনোই কোনো কোয়াক ডাক্তারকে রোগ নিরাময়েও দেয় না। এখানে প্রচলিত ধারণার সাম্যকে প্রয়োগ করতে হলে তো দুই ডাক্তারকে দাঁড়ি পাল্লায় মেপে একই মূল্য দিতে হয়। আর্থসমাজ কি তা দেয়? অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে জ্ঞানীগুণীর জ্ঞান, গুণ ও সততার কোনো মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকে না। সেই গুরুত্ব ও মর্যাদাকে চোর, ছ্যাঁচড়, মাথামোটা এমনকি পাগলের সাথেও একাকার করে দেওয়া হয়, গণ জন রণের কোনো পার্থক্য থাকে না। যা নির্বাচনের নামে পাশা খেলা। এবং মানুষ যেহেতু অঙ্কুরগতভাবেই সত্তার অতলতলী, সুতরাং তার পাল্লাটা সেই দিকেই ভারি — যাতে অসতের হাতেই ক্ষমতাটা চলে যায়। পুঁজি সংক্রমণী আর্থসমাজে নির্ভর যোগ্য জীবিকা জুটানো লটারির টিকিট লাগানোর মতো। তখন জীবনের প্রতি

হতাশার সংক্রমণে শ্রমমানসে দেখা যায় হিংস্রতা, হঠকারিতা আর শেষে ঐতিহ্যিক গুরুবাদ। যে ছন্দপতিত জীবনের শ্রমমানসে রূপ, রস, স্বাদ, গন্ধের ভোগ বাস্তবতাই তখন অধরা। যাতে মূল্য হারিয়ে জীবনবোধ বিশেষিত হয়ে যায় পরগাছামি, উঞ্ছবৃত্তিতে। সেই বৈষম্যে আর্থসমাজ হয়ে যায় ভারসাম্যহীন। অচলায়তনী সেই সমাজে বাড়তে থাকে প্রথা পালন। মহাভারত বিরোধী যে কোনো তন্ত্রের প্রয়োগে পাণ্ডবদের ক্ষমতায় আসা কখনোই সম্ভব নয়। সেই ভারসাম্যহীন সমাজে ভোট কেনা ও দুর্বৃত্তায়নে গণতন্ত্রের মাথা প্রতি ভোটে মেধা-যোগ্যতার বনবাসে কৌরবরাই ক্ষমতায় আসে।

**বাস্তবানুগ নির্বাচন পদ্ধতি (ভোটিং পাওয়ার অর্জন)**

ভোটের লক্ষ্যই হল আর্থসামাজিক শ্রমের উদবৃত্ত মূল্য বিন্যাসী যোগ্যতম নেতৃত্ব নির্বাচন। কিন্তু বাস্তবানুগ নির্বাচন ছাড়া তা কখনোই সম্ভব নয়। মানুষ অবদান বাচক কে কতখানি জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থ ও রাজনীতি দিয়ে সমাজবিকাশে সহযোগিতা করতে পারে। যা উদবৃত্ত মূল্য নিহিত প্রধান প্রযুক্তি। এই অবদানের জন্যই দর্শন সাপেক্ষ যোগ্যতম নেতৃত্ব নির্বাচনে ভোটিং পাওয়ার অর্জনের তত্ত্ব ও তাগিদ। শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, ক্লার্ক, আধিকারিক, WBCS, IPS, IAS, বিচারক ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতার নিরিখেই চেয়ার নির্ধারণ হয়। মানবতার যুক্তি তর্কে বিবেচ্য কী তা মানুষের ভাবা দরকার। যেখানে মানুষের যোগ্যতা বাচক চেয়ার নির্ধারণ সম্ভব হয়, তার যোগ্যতা বাচক শ্রম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়, তার যোগ্যতা বাচক শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়, আর এই সকল যোগ্যতাকে পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই? তাতে কি সেই সকল যোগ্যতা চাপা পড়ে না?


**ভয়েস মার্ক**

**আর্থসমাজ সংস্কৃতির বিশেষক পত্রিকা**

গল্প, কবিতা, নাটক/নাটিকা, প্রবন্ধ, সাম্প্রতিক আর্থসামাজিক ঘটনা সমূহের বিশ্লেষণ ইত্যাদি চর্চার মাধ্যমে ভয়েস মার্কের পথ চলার সাথী হোন।

লেখা পাঠান পত্রিকার ঠিকানায় বা ইমেলে।

যোগাযোগঃ 9434655610 / 9932607714

Email: voicemark19@gmail.com

# আমিত্ব বিস্মৃতির পরিণাম

**কিংশুক**

মেয়েটির নাম সখিনা। বাবা তথাকথিত মৌলবি। মাদ্রাসা-মসজিদে ছেলেমেয়েদের আরবি পড়িয়ে সামান্য কিছু টাকা পান। বাড়িতে তিন ছেলে, তিন মেয়ে। পরপর তিন ছেলের পর তিন মেয়ে। সখিনা সবার ছোটো। সখিনার দাদারা নিজেরাই বিভিন্নভাবে সামাজিকতা মেনে বিয়ে করে সংসার করতে থাকল বাবা-মায়ের কোনো উদ্যোগ ছাড়াই। তারা বাবা মা থেকে পৃথক হয়ে গেল। সখিনার বড়ো দুটি দিদিও একই ভাবে কোনো রকমে বিবাহ সম্পন্না হয়। সখিনাকে নিয়ে তার বাবা মা দিন গুজরান করতে থাকলো। সখিনার মা এর স্বভাব একটু অলস নবাবি প্রকৃতির। বাড়ির কাজ রান্নাবাড়া সব কিছুই সখিনাকে করাতে থাকলো। মা গায়ে বাতাস দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। কিন্তু সখিনার প্রতি তাদের কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ নেই। সখিনা যে যৌবন পার করে চলেছে সে দিকে তাদের নজর নেই। বিয়ে দেয়ার কোনো প্রকার উদ্যোগ নেই। সখিনা মেয়েটি দেখতে যে খুব খারাপ তাও নয়। নিরোগ, সবল, সুউচ্চ, শ্যামলা। তবে কে করবে তার বিয়ের সম্বন্ধ? তার বাবা ওসমান বলেন, ‘ওপরওয়ালা চাইলেই হবে, আমার আর করার কী আছে? তিনি যেদিন ভাগ্যে জোটাবেন সেদিন হবে। সবই আল্লার ইচ্ছা’।

আজ সখিনার বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। তার দাদা দিদিদের ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয়ে তাদেরও সন্তান সন্ততি হয়ে গেছে। সখিনার বাবা মাও সেই আগের মতোই চলছে। পাড়া পড়শিরা দু একটা বিয়ের সম্বন্ধ নিয়েও এসেছে। কিন্ত তাকে ছেলে পক্ষ আর পছন্দ করছে না। মুখমণ্ডলে বয়সের ছাপ পড়ে গেছে।

বাবা মা আজ বৃদ্ধ। আর বেশিদিন এই ভুবনে কাটাতে পারবে বলে মনে হয় না। সখিনার কী হবে? সে কী নিয়ে সংসারে বাঁচবে? শুধু খাওয়া পরা? আত্মীয়দের গঞ্জনা-লাঞ্ছনা? বাকি জীবনটা তাকে নরক যন্ত্রণায় থাকতে হবে নাকি? তার এই জীবনের জন্য কে বা কারা দায়ী? তার বাবা মা? সে নিজে? না, আর্থসমাজ? কার বা কাদের আমিত্ব বিস্মৃতির পরিণামে তাকে এই নরকে পড়তে হল?

আমরা বিষয়টির আগাপাশতলা একটু ভালো করে পরখ করলেই এর সন্ধান পেয়ে যেতে পারি। মানুষ বিবাহ তথা দাম্পত্য সম্পর্কে কেন আসে? এর লক্ষ্যই বা কী?

দাম্পত্য সম্পর্কের উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির অস্তিত্ব তথা আমিত্বের বিকাশ। অর্থাৎ আমিত্ব শক্তির বিকাশ ও প্রসারণই হল দাম্পত্যের লক্ষ্য। সেই দাম্পত্যের থেকে আসা আগামি প্রজন্মের শৈশব, কৈশোর, যৌবন যথার্থভাবে প্রস্ফুটিত করার দায়িত্ব কর্তব্য দম্পতি এবং সমকালীন আর্থসমাজের উপর বর্তায়।

আমরা ব্যক্তির দায়িত্ব কতর্ব্যের দিকটি বিশ্লেষণ করলে কী দেখতে পাই?

ব্যক্তি যদি না জানে সে কেন দাম্পত্য সম্পর্কে এসেছে তবে তার সব দায়ভাগ গিয়ে পড়ে তথাকথিত ওপরওয়ালা উপর। আর তখন সেই দম্পতির ভবিষ্যৎ জেনারেশনের সবটাই তথাকথিত ওপরওয়ালা নির্ভর হয়ে পড়ে অর্থাৎ গোটাটাই অন্ধকারের বিষয় হয়ে যায়। সেই জেনারেশন তখন অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, কালা, চোর-ডাকাত, খুনি, পোশাকি ভদ্র, অলস প্রভৃতি যা কিছু হতে পারে। ব্যক্তির সেখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যার ফলে সেখানে মানুষ রূপী অন্ধকারের জীবই জন্ম নেয়। আর জন্মের পর, যে ব্যক্তির নিজের প্রতি নজর থাকে না, সে সন্তান সন্ততিদের আমিত্ব বিকাশনী পরিবেশ গড়ার কথা কি চিন্তা করতে পারে? ফলে যা হবার তাই হয়। উত্তর জেনারেশন কোনো প্রকার জীবনের গাইডলাইন পায় না। জীবনের কোন পথে গেলে জীবনটা উপভোগ করা যায়, নিজের প্রতি দৃষ্টি না থাকায় জীবনে দুর্ভোগ পোহাতে হয়, তা তাদের গোলক ধাঁধায় ফেলে দেয়। তখন তারা মেতে যায়

তাৎক্ষণিকতার জড় সুখে। রক্ষণকামিতার পাল্লায় পড়ে দিশাহারা হয়ে নিয়তি তথা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। সামনের দিকে এগোনোর পথ দেখতে ব্যর্থ হয়। সেই অন্ধকারে কেউ কেউ হাতড়াতে হাতড়াতে কিছু পেলে তাতেই আবর্তিত হয়। আর না পেলে খড়কুটোর মত সারা জীবন অকূল পাথারে ভেসে চলে। কিন্তু তীরে উঠতে আর পারে না। তার তীর্থ করা হয় না। রক্ষণকামিতার জালে আটকা পড়ে, তাতেই আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যায়। সেই কারাগারের বন্দি জীবনের যাতনায় জর্জরিত হতে থাকে। সেখান থেকে বেরোনোর তাগিদ ও প্রেরণা সে নিজেও আনতে পারে না, বাইরে থেকেও পায় না।

আমরা এখানে একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি, যে ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে ভাবে না, অর্থাৎ তার সত্ত্বানুভূত যে শক্তি তাকে গড্ডালিকার আর্বতনের বিপরীতে ভাবায়, প্রশ্ন তোলে, সেই শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পিত করে না, যে অপশক্তি তাকে নিচের দিকে টেনে নামায়, হেয় করে আপতিকভাবে তাতেই আবর্তিত হয়। সেই অপশক্তির জড়সুখের টানে পড়ে জর্জরিত হয়, অমর্যদায় পড়ে, যন্ত্রণায় কাতর হয়। সেটি কারোর অনুভবে আসে, কারোর আসে না। কিন্তু সেই আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে প্রয়াসের দরকার, অপশক্তির বিপরীত মেরুর আনন্দানুভূতির শক্তিকে জাগানো প্রয়োজন, তা সে করতে ব্যর্থ হয় বা পারে না। অর্থাৎ তার আমিত্ব বিস্মৃতি ঘটে। যার পরিণামে সে নিজে যেমন নরক যন্ত্রণার কারাগারে বন্দি হয়ে যায়, তার উত্তর জেনারেশনকেও সেই একই কারাগারে জন্ম দেয়। যে জেনারেশন তার পূর্বপুরুষের রক্ষণকামিতার কব্জাকৃত সঙ্কোচনী দেহকোশ নিয়ে জন্মাল তার উপর এসে পড়ল দ্বিগুণ বোঝার ভার। সেই বোঝার ভারকে সে ওভারকাম করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করছে সেই আনন্দ শক্তিকে জাগাবার দ্বান্দ্বিকতায় সে নিজেকে দ্বান্দ্বিক হিসেবে গঠন করছে কিনা তার উপর। অর্থাৎ আমিত্ব শক্তির কর্ষণেই নিহিত ব্যক্তি তথা আর্থসমাজের আছট উৎপাটনের কৌশল।

আর্থসমাজের কি কোনো দায় নেই, কোনো ভূমিকা নেই, যাতে করে ব্যক্তির নিজেদের প্রতিবন্ধকতাগুলি শনাক্ত হয় এবং তার দিশালক্ষ্যবাচক পদক্ষেপী গাইডলাইন পায়?

ব্যক্তির সমাহারেই সমাজ। সেখানে মানুষের শ্রমের বিনিময়েই গড়ে ওঠে আর্থসমাজ। মানুষ সর্বদায় শ্রমমূল্য সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু সে সেই শ্রম সৃষ্ট মূল্য সম্পূর্ণ পাক, অথবা না পাক, পদার্থের রূপান্তর ঘটতেই থাকে। সেই আর্থসমাজ থেকে শ্রমিক তার সৃষ্ট মূল্য পাবে কি পাবে না, তা নির্ভর করছে, সেই আর্থসমাজ পরিচালনার ক্ষমতা কোন শক্তি চরিত্রের আওতাধীন তার উপর। যদি তা সঙ্কোচনী অপশক্তির কব্জায় অর্থাৎ রক্ষণকামিতার নাগালে থাকে তবে শ্রমিক কখনোই তার সৃষ্ট মূল্য যথার্থরূপে পায় না। অর্থাৎ মূল্যনীতি বা অর্থনীতির সবটায় থাকে অন্ধকারে। যে অন্ধকারে আর্থসমাজ একটা অচলায়তনে পরিণত হয়। টোটাল আর্থসমাজই জঙ্গলে সংক্রামিত হয়। তখন সমাজের মূল্যনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিবাহনীতি, গার্হস্থ্যনীতি, শিক্ষানীতি সবটায় খণ্ডিত, মিশ্রিত, বিকৃত হয়ে পড়ে। কোনোটির সাথে কোনোটির লিঙ্ক থাকে না। হ্যাড্ডা ব্যাড্ডা, জোড়াতালি দিয়ে ক্ষমতার অপনেতৃত্ব টেনে নিয়ে চলে। শ্রমিক বা মানুষের কাছে সব কিছু গুলিয়ে যায়। মানে রক্ষণকামিতা গুলিয়ে দেয়। ফলে তাদের কাছে উক্ত সকল ক্ষেত্রগুলি সবটাই জবড়জং হয়ে পড়ে। সুষ্ঠু স্বাভাবিকতা থাকে না। তাই সেখানে অভিভাবকরাও যেমন বিভ্রান্তিতে পড়ে, তেমনি তার উত্তর জেনারেশনও সেই একই পাঁকে মজে যায়। ফলে সংসার সহজ ভাবে চলে না, বিদ্যালয়ের শিক্ষায় জীবনের পথচলার সুস্পষ্ট চিত্র পায় না। একাডেমিক শিক্ষামানের কর্মক্ষেত্র পায় না। বেশির ভাগ মানুষকেই যেনতেন প্রকারেণ কাজ জোটাতে হয়। ফলে তার গার্হস্থ্যজীবন তথা বিবাহ জীবনের কোনো ঠিকঠিকানাও থাকে না। সবকিছু গোলমেলে হয়ে যায়। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দিতে বা করতে অনেকেই ব্যর্থ হয়। কারণ সমাজ নেতৃত্ব কোনো নীতি বা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে না। ফলে সেই আর্থসমাজে নানান ধরনের বিকৃতির সংক্রমণ ঘটে যায় যখন তখন, যেখানে সেখানে। এই জংলি সমাজের থেকে উত্তর জেনারেশন

নিজের একক প্রয়াস ছাড়া কখনোই বেরিয়ে আসতে পারে না।
আমরা উক্ত ঘটনায় দেখেছি, এখানে ব্যক্তি ও আর্থসমাজ উভয়েই ব্যক্তি জীবনের আমিত্ব বিস্মৃতির পরিণামের জন্য দায়ী।

---

## নেতাজি

**সোহেল রানা (ফকির)**

আমাদের বেঁচে থাকা এতটা স্বাধীন
পায়ে পায়ে চলাফেরা ঘাড় গুঁজে জিদ
শির তুলে দাঁড়াতে যে কষেছিল জিন
ধোঁয়াশায় খুঁজছি আজ কোথায় শহীদ !

বিমানের ধোঁয়া গড়ে আকাশের পথ
শহীদের রঙে ফিরে না ক্যালেন্ডার
তেইশের তিথি শুধু পুষ্পের ভারত
নিখোঁজ শব্দ আওড়ায় আমরা যে
মার্ডারার !

রূপকথার জন্ম আজ শির তুলে সম্মুখে
শুনবে না ইতিহাস শিশুর কণ্ঠস্বর
ফিরে এসে বলো বীর সাহস দিয়ে বুকে
আমার দেশ নয় রক্তাক্ত ধর্মের ঘর

## শবরীমালা

**অশনিকা ঋদ্ধি**

শবরীমালায় গুহা মানবের জান্তব যাপনে
কাল কাটে

হামাগুড়ি দিয়ে সরীসৃপ হাঁটে,
সারা গায়ে গুটি গুটি ঘা, দূরারোগ্য ব্যধি
আক্রান্ত ঐতিহ্যের স্বাক্ষর
এই সব কিলবিলে পোকা
সাজানো ন্যায়ালয়ের শরীর মনে
কালিমা লেপে দেয় অবলীলায়

হুমকি আর হুঙ্কারে ন্যায়াধীশের বিচার টলে যায়
মৃদু হাস্যে উড়ে যায় বিচারের বাণী

চোখ বন্ধ করে মাকড়সার জালে ডুব দিয়ে
অপার পিপাসা, তীব্র ভক্তি ভরে
আদিম উল্লাসে শহীদ হতে চায়

আফিম খাবার অধিকারের লড়াই
যুগ যুগ জিঁইয়ে রাখে বর্ণবাদের ফেরিওয়ালা

ধরি মাছ না ছুঁই পানির
খেলা খেলে শকুনির মন্ত্রিসভা
মানবাধিকার ! সে তো দূর দূর কোটি
আলোকবর্ষ দূরে

প্রগতিশীল মার্কা ডুবন্ত সাইনবোর্ড
জেগে ওঠে ভারত মহাসাগরের তীরে,
দেবালয়ে নারীর অধিকার ফেরানোর
সংস্কারী হাত কোন গর্তে ডুবতে চায় !

# জাত, ধর্ম ও আমরা

**শ্যামল কান্তি পাড়ুই**

মাধ্যমিক পাশ করার পর কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম তুলতে গিয়ে বুঝলাম, আমি কোন জাতের লোক। প্রথম দিন বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছিল, কারণ উত্তরটা আমার জানা ছিল না। পরের দিন বাবাকে জিজ্ঞেস করে আবার গিয়েছিলাম। বাবা বলেছিল, 'মাহিষ্য' লিখবি। আমার সঙ্গে আর একজন সহপাঠি বন্ধুও গিয়েছিল কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নাম লেখাতে। ও একটু আড়াল খুঁজে সাব কাস্টের জায়গায় লিখেছে 'মুচি'। ওর এই আড়াল খোঁজা, জড়তা, আমাকে বেশ কৌতূহলী করে তুলেছিল। আমাকে ওর সাব কাস্ট জানাতে এতো সঙ্কোচ কেন ! আমি সেদিন বুঝতে পারছিলাম না ঠিক ! ও তো আমার যথেষ্ট কাছের বন্ধু, আমাদের বাড়িতে ওর অবারিত দ্বার। কখনও কখনও হাঁড়ি থেকে একসঙ্গে ভাত বেড়েও খেয়েছি। এক সঙ্গে পড়াশুনা করা, সুখ দুঃখে অনেক সময় কাটিয়েছি দুজনে। তাহলে নিজের জাতি লিখেও এতো লুকনোর চেষ্টা কেন? অনেক পরে বুঝেছিলাম মনের মধ্যে একটি হীনমন্যতা কাজ করছিল ওর। 'শিডিউল কাস্ট' এই একটা শব্দবন্ধ ওকে সংকুচিত করে রেখেছিল। ও জানত আমি 'সাধারণ কাস্ট' মানে জেনারেল ক্যাটাগরি ভুক্ত। আমার সহপাঠী বন্ধুর পদবি ছিল 'রুইদাস'। আমরা জানতাম ওর দাস পাড়ায় বাড়ি। আমাদের স্কুলের দেওয়াল লাগা ওদের পাড়া। আমি খুব ছোট বেলায় ওই পাড়ায় গিয়েছি কয়েক বার। আমার জ্যাঠামশাইয়ের এক বন্ধুর বাড়ি ছিল ওই পাড়ায়। তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া। বেশ পরিষ্কার মনে আছে দাস জেঠিমা একদিন চিনি দিয়ে মুড়ি দিয়ে ছিল। নিকানো উঠোনে বসে বড় বাটিতে মুড়ি খেয়েছিলাম। দুয়ারের ছাউনির বাঁশ থেকে আঁকশিতে ঝুলানো ঢাক দেখে ছিলাম। পাশের বাড়ির উঠোনে আমাদের স্কুলের সতীনাথদার বাবা বাজনায় রেওয়াজ করছিল। আর একজন লোক চোঙ ওয়ালা লম্বা একটা কালো বাঁশিতে সুর ভাঁজছিল। তখনও জানতাম না ওই বাঁশিটার নাম ক্লারিওনেট। আজ কেন ওর এতো সঙ্কোচ? এই প্রশ্নই আমাকে পরবর্তী সময়ে জাতপাত নিয়ে জানতে আরও বেশি আগ্রহী করে তোলে। আকৃষ্ট হই এই সমাজ কাঠামোটাকে বুঝতেও।

দ্বিতীয় একটা ঘটনাও আমাকে খুব পীড়া দিয়েছিল। আমার এক মামার ছেলে, বয়সে আমার থেকে ছয়-সাত বছরের বড় হলেও বেশ সখ্যতা ছিল আমাদের মধ্যে। বছর দুই আগে হঠাৎ একদিন জানতে পারলাম ঐ দাদার ক্যানসার প্রায় শেষ ধাপ ছুঁয়েছে। তার দু আড়াই মাসের মধ্যেই সব শেষ। আমি সেদিন খুব সকালেই পৌঁছেছিলাম মামা বাড়ি। কষ্ট পেয়েছিলাম খুব, একটা ছোট মেয়ে আর বউদিকে রেখে দাদার অকাল প্রয়াণে। এই ঘটনার মাত্র বারো-তেরো দিন আগেই আমার অন্য মামার এক ছেলেরও আকস্মিক প্রয়াণ ঘটেছে। খুব কাছাকাছি দুই যুবকের অকালমৃত্যু, পরিবারে স্বাভাবিক ভাবেই এক মর্মান্তিক শোকের পরিবেশ রচনা করেছে। তার থেকেও অবাক হলাম, যখন দেখলাম, দাহ করার জন্য সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পরও দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, কারণ ব্রাহ্মণের অনুমতি মিলছে না। ঠিক কত দিনে এই দ্বিতীয় মৃত্যুর শ্রাদ্ধ কর্ম সম্পন্ন করা হবে এই নিয়েই গোল বেধেছে। সদ্য একটি অশৌচ থেকে বেরতে না বেরতেই আবার একটি অশৌচ কর্ম শুরু। তাই এই দ্বিতীয় বারে চারদিনে কাজ করার আবেদন ছিল ব্রাহ্মণের কাছে। তিনি কিছুতেই রাজি নন এই নতুন প্রস্তাবে। তাই মৃতদেহ পড়ে থাকলো বেশ কিছুক্ষণ। অনেক সাধ্য সাধনার পর, চরম অনাগ্রহ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুরোহিত অনুমতি দিলে শবদেহ কাঁধে উঠলো শ্মশানের উদ্দেশ্যে।

এই দুটি ঘটনায় আমার জাতপাত আর উচ্চ বংশীয়দের অকারণ সমাজ নিয়ন্ত্রক মানসিকতার প্রতি ক্ষোভের উদ্রেক করে। এমন কুৎসিত ব্যবস্থাপনার এই

প্রচলিত পরিকাঠামো সর্বদাই পীড়া দায়ক।

আমাদের সমাজে নানান বৈষম্য আছে। সম্পদে, সক্ষমতায়, সুযোগে, সদ্ব্যবহারে বৈষম্য সর্বত্র। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মানুষই মানুষের দ্বারা শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, পদদলিত। তথাকথিত ধর্মীয় সংস্কার চালিত ভারতীয় সমাজ উন্নত চেতনার মানুষ গঠনের এক বড় অন্তরায়। ভারতবর্ষের সিংহভাগ মানুষ তথাকথিত শাস্ত্র মতে শূদ্র। বলা বাহুল্য, এই তথাকথিত শাস্ত্র এক শ্রেণির মানুষের স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার। এই বৃহত্তর শূদ্র শ্রেণিকে এমন এক পোক্ত ব্যবস্থাপনায় বেঁধে রাখা আছে, তা থেকে বেরিয়ে এসে উন্নত চেতনার মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া তাদের পক্ষে মোটেই সহজ নয়। শুধুমাত্র দৈহিক শক্তির জোরেই কেউ কাউকে চিরদিন দমিয়ে রাখতে পারে কি? মানসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মাদকতার শৃঙ্খলের যে সুনিপুণ পরিপক্ক ব্যবস্থাপনা তাকে ভেঙে বাইরে আসবে তার শক্তি কোথায় ! কেমন সেই পরিপক্ক ব্যবস্থাপনা?

একটু আগেই মামার ছেলের অকাল মৃত্যুর সৎকাজের সময় উদ্ভূত পরিস্থিতির উল্লেখ করেছি। এবার একটু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত রীতিগুলোর দিকে দেখা যাক।

তথাকথিত শূদ্র শ্রেণি সন্তানের জন্ম দিতে পারে কিন্তু তার নাম রাখতে আচার্য ডাকে, জন্মের ক্ষণেই এরা সন্তানকে অশুদ্ধ মনে করে, শুদ্ধ করতে ব্রাহ্মণ ডাকে। এরা বিয়ে করবে বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারলেও বিয়ে করতে পারে না, ব্রাহ্মণ ডাকতে হয়। অনেক সময় সব কিছু পছন্দ হলেও শুধু মাত্র ঠিকুজী মিলছে না বলে বিয়ে করা থেকে পিছিয়ে যায়। এরা কষ্ট করে খেটে বাড়ি বানাতে পারে সেই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে না, ব্রাহ্মণ ডাকতে হয় গৃহপ্রবেশের জন্য। এরা জীবিকা সম্প্রসারণের জন্য ছোটখাটো ব্যবসা, দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিতে পারে কিন্তু ওই ব্যবসা শুরু করতেও পুরোহিত ডাকতে হয়। এমন কোন দোকানদার পাবেন না যিনি দোকান খোলার পর ধূপ জল না দিয়ে গদিতে বসেন। পরিশ্রম করে চাষ করলেও খেতের প্রথম ফসল ধর্মস্থান বা মন্দিরে পুজো দেয়। আর সেই প্রথম সংগৃহীত নবীন ফসল ব্রাহ্মণের ভোগ্য হয়। মরেও কি শান্তি আছে! মরার পরেও পুরোহিতের বিধান মেনে শ্রাদ্ধশান্তি, অশৌচ পালন ও নিয়ম ভঙ্গ। অর্থাৎ সারা জীবন চক্রেই, জন্ম থেকে মৃত্যু সবই নানান ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে বাঁধা। যজমানের মঙ্গলার্থে ব্রাহ্মণ যে সার্ভিস দেন, কড়ায় গণ্ডায় নিজের পাওনা বুঝেই তবে সার্ভিস দেন। কী সুন্দর ব্যবস্থাপনা ! ধর্মীয় মোড়কে সামাজিক শোষণ নির্ভরতার সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা থাকলেই তো আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। এক জন উপবীতহীন জনজাতির মানুষ সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেও ঠিক করে নিজের পেট ভরানোর ব্যবস্থা করতে পারে না, অন্যদিকে আর এক শ্রেণি আঙুলে উপবীত জড়িয়ে অন্য হাতে ঘণ্টা নেড়েই সম্মান প্রতিপত্তির সঙ্গে নিজের দুমুঠো অন্ন সংস্থানের পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাই তো পিছিয়ে পড়া মানুষদের কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি ব্যবস্থায় কিছু সুযোগ থাকলেও, সামাজিক ব্যবস্থায় আমরা এগিয়ে থাকা লোকেরা বোধহয় তা ঠিক মেনে নিতে পারি না ! যদিও সব শ্রেণিতেই ধান্দাবাজ, সুযোগ সন্ধানী মানুষের অভাব নেই। গাছেরও খাওয়া আর তলারও কুড়িয়ে রাখতে তাদের ভুল হয় না।

অন্তজ শূদ্র শ্রেণির জীবনযাত্রার প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব। সমাজের ভয়, জাত হারানোর ভয়, ভাত হারানোর দুশ্চিন্তা, সাত পুরুষের জল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। সবকিছু মিলিয়ে এরা প্রকৃত অর্থেই পরনির্ভর, বলা ভাল পুরোহিত নির্ভর। এরা নিজেদের জীবনের কোনো সিদ্ধান্তই নিজেরা নিতে পারে না। ভুল আর ঠিকের তফাৎ বুঝতে পারে না। মা, বাবা, আস্থা ভাজন নিজের আত্মীয়ের থেকেও ব্রাহ্মণের কথায় বেশি প্রভাবিত হয়। 'কী' বলছে সে নিয়ে এরা মাথাই ঘামায় না, 'কে' বলছে তাতেই বেশি নিশ্চিন্ত।

এছাড়াও আছে ধর্মগুরু, বাবাজী, মাতাজি, সন্ন্যাসী, সাধু, নানান পুজো অর্চনা, ক্রিয়া কর্ম, যাগ যজ্ঞের ভড়ং। যুক্তিহীন বা অপযুক্তির ধর্মীয় বইপত্র, সব রকম

মগজ ধোলাইয়ের উপকরণ সমাজে বিদ্যমান। রাজনৈতিক ভাবেও সরকার পক্ষ, বিরোধী পক্ষ, নির্দলীয় সবই উচ্চ বংশীয়দের করায়ত্ত। নিম্ন বর্গের অসংগঠিত মানুষ নিজেরা একজোট হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই করবে তাও অলীক কল্পনা। কারণ সেখানেও অনেক ছোট বড় গর্ত খুঁড়া আছে। এই সিংহভাগ শূদ্রকেই নানান জাতের ঘরে বেঁধে রাখা আছে বেশ কায়দা করে। মজার ব্যাপার এরা কেউ কাউকে ভাল ভাবে চেনেই না, পরস্পরের দুয়ারে এরা বসে না। নিজেরাই নিজেদের ঘৃণ্য, তুচ্ছ, অচ্ছুত মনে করে। রাজণ্য দাক্ষিণ্যে এরা কেউ এসসি, কেউ এসটি, আবার কেউ বা ওবিসি। আরও কত ব্যবস্থাপনা এদের জন্য। কত কর্পোরেশন, পর্ষদ, উন্নয়ন সংস্থা, শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর, কত ধরনের কত রঙের কার্ডে পরিচিতি, তবুও এদের দিন ফিরে না। সামজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অবস্থানে প্রান্তিকই থেকে যায় এরা।

বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে এসেও এখনও মানুষ কেন তথাকথিত ধর্মের মোহ কাটিয়ে মানবতার সুকুমারবৃত্তি গুলো অনুশীলনে অপারগ? কারণ আমাদের সমাজ শক্ত ধর্মীয় সংস্কারের সুতোর বুননে গাঁথা। সংস্কার তার মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যুগযুগ ধরে। এ বাঁধন ছিঁড়তে হলে, এ সংস্কার উপড়ে ফেলতে হলে, চায় ঘরে ঘরে বিপ্লব।

বিশ্ব-জগত সৃষ্টি নিয়ে কোন মানুষেরই বোধ হয় কৌতূহলের অন্ত নেই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে, যুক্তি বোধের প্রসার ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, কল্পনার আশ্রয় ক্রম হ্রাসমান। বিজ্ঞান সচেতন, যুক্তিবাদী সাম্য সমাজ ব্যবস্থার এক বড় অন্তরায় ধর্মীয় মাদকতার বিষ। যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, নেই কোন উপকারিতা, মানুষ তাকে নিয়ে কেন এত মাতামাতি করে? ভাল করে দেখলে বোঝা যায় এর পিছনে আছে এক শ্রেণির মানুষের কায়েমি স্বার্থ আর অপর পক্ষের আজন্ম লালিত সংস্কার, অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, যুক্তিবোধ ও উন্নত চিন্তা ভাবনার অভাব। বর্তমানে যাদের পেটে ভাত জুটে না, পরনে কাপড় জুটে না, ভবিষ্যতে তারা কল্পিত স্বর্গে সুখে থাকবে, এর থেকে বিকৃত ভাবনা আর কি হতে পারে? ঈশ্বর, দেবদেবীদের নিয়ে জিজ্ঞাসার তো শেষ নেই। তাঁরা কোথায় থাকেন? কেমন দেখতে? স্বর্গটা ঠিক কোথায়? ঈশ্বর, দেবদেবীরা নাকি স্বর্গে থাকেন। মানুষ মরলেও নাকি স্বর্গে যায়? তখন কি দেবদেবীদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়? ঈশ্বর ও দেবদেবীর মধ্যে কি কিছু পার্থক্য আছে? এত যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সুনামী, ভুমিকম্প, বন্যা, ঝড়, মহামারি, এইডস, ক্যান্সারের মতো প্রাণঘাতী সব কাণ্ড, এসবও কি দয়াময় ঈশ্বরের কল্যাণে?

যুগে যুগে দেশে দেশে কায়েমি শ্রেণি ধর্মের বর্মে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করলেও সভ্যতার ইতিহাস অন্য কথা বলে। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের উপকরণে, দেবদেবীদের মধ্যেও পরিবর্তন, পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ব নিয়মের বিবর্তনের ফসলই তো মানুষ। 'দেবতা' মানুষেরই সৃষ্টি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই। তার সব থেকে বড় প্রমাণ মানুষের দেবতা মানুষেরই মতো দেখতে। কারণ মানুষ নিজেকে ছাড়া তার থেকে উন্নত আর তো কোনো প্রাণিকে কখনও দেখেনি। মানুষের আচার আচরণের সঙ্গে দেবতার জীবনযাত্রারও বিশেষ তফাৎ পাওয়া যায় না। শুধু মাত্র অলৌকিকতা ছাড়া। কিছু কিছু মানুষও এই অলৌকিক কারিকুরি দেখিয়ে নিজেদের মহাপুরুষ, স্বঘোষিত অবতার বা গুরুবাবা, কি গুরুমা, অথবা মাতাজি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করে। যুক্তির কোষ্ঠী পাথরে এই সব বুজরুকি অলৌকিক কারিকুরি যখন ধরা পড়ে যায়, তাদের গুরু মহিমার ফানুস ফেটে যায়।

বছর পাঁচ-ছয় আগের ঘটনা। আমার এক ইংরেজি স্কুল শিক্ষিত মহিলা সহকর্মী একটু অবসরে হঠাৎ তার মায়ের গল্প শোনাতে শুরু করলো। জানেন দাদা, আমার মায়ের না গোপাল ঠাকুর আছে। আমি বললাম, তো? অনেকের ঘরেই তো গোপাল থাকে? না, তা হয়তো থাকে, তবে আমার মা তার গোপালকে নিয়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত, সব সময় গোপাল আর গোপাল, গোপাল কে খাওয়ানো, স্নান করানো, শোয়ানো, ঘুমপাড়ানো, সব করে। আমি বললাম, বাঃ বেশ ভাল তো! তোমার মায়ের গোপাল তো মানুষেরই মতো সব কিছু করে। আচ্ছা তোমার মা কে জিজ্ঞেস করো তো,

গোপালকে 'পটি' করায় কখন? আমার এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে প্রথমত ফিক ফিক করে হাসি তার পর এক অবাক বিস্ময় ! ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে আপনার এই সব কথা বলতে সঙ্কোচ হয় না? আমি বললাম, তা কেন? দেখো তুমিই তো বললে, তোমার মা গোপালকে খুব যত্ন করে অনেক কিছু খাওয়ান, তা গোপাল যে এতো খায় তার 'পটি' পায় না?

তাছাড়া আমি আর একটা কথা ভাবি, এই যে সরকার এতো চেষ্টা করছে মানুষকে শৌচাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে, যদি দেবদেবীদের শৌচকর্মের এমন কোন দৃষ্টান্ত থাকে তাহলে বোধ হয় সরকারের আর একটু সুবিধা হতো সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে। দেবতারা তো সবই করেন মানুষের মতো, খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো, নাচ গান, ঝগড়াঝাঁটি, যুদ্ধ, আর দেবদেবীদের যৌন জীবন পর্যালোচনা করলে তো বিস্ময়ের শেষ নেই। যতরকমের অনাচার, গর্হিত আচরণ মানুষের সমাজে দেখা যায় দেবতাদের সমাজেও তো তার ব্যতিক্রম নেই। শুধু কোনো দেবতাকেই আমি কখনও শৌচকর্ম করতে শুনিনি। স্বর্গে বোধ হয় শৌচাগার নেই। তোমার মায়ের গোপাল তো তোমার মায়ের ঘরেই থাকে তাই ভাবছিলাম গোপালকে 'পটি' করায় কিনা।

কর্মী বন্ধুটির সংক্ষিপ্ত উত্তর ছিল— 'ঠিক'আছে জিজ্ঞেস করব মা কে'। বলা বাহুল্য এই দীর্ঘ পাঁচ-ছয় বছরেও সেই উত্তর মেলেনি।

কৃষি কাজের সূচনা পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব প্রায় এগারো হাজার বছর আগে। আর খ্রিস্টপূর্ব প্রায় আট হাজার বছর আগে মানুষ দলবেঁধে গ্রামে বসতি গড়ে। এবং ধ্রুপদী বিশ্ব বলতে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় পাঁচশ বছর সময়কালে গ্রিস, রোম, পার্শি, ভারতীয় ও চিন সভ্যতার উৎকর্ষতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে দেখা যায় যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রয়োগ, উন্নত শিল্পকলা, আর নব ধর্মেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটতে। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস বলে সামাজিক জীবন পার্থিব যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাপার, সেখানে অতীন্দ্রিয় ব্যাপার টেনে এনে জটিলতা বাড়ান কেন? মানব সমাজের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে এই ধর্ম ধারণা এক বিপজ্জনক অন্তরায়। ধর্ম ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করে চলেছে। যে ধর্মের ভিত্তি কেবলমাত্র অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধ আনুগত্য, তার অনুশীলনে মানব জীবনের সার্থকতা কোথায়?

---

# অঞ্জলি

**তানিয়া খাতুন**

আস্তাকুঁড়ের আঁতুড় ঘরে
আগামীরা ডুকরে মরে
নীল আলোতে আছড়ে পড়ে,
মৃত্যু মিছিল এগিয়ে চলে

চাঁদ বুঝি আজ যাচ্ছে সরে
রাহু-কেতুর গ্রাসের ভয়ে
তিরন্দাজের তিরগুলি তাই
মিথ্যে জলে গা ভেজায়ে

সঙ্গে ওদের ছল চাতুরী
শবদেহরা উল্টো হাঁটুক,
তোমার হাতের স্পর্শ এবার
রক্তজালক ছড়িয়ে পড়ুক

গোলাপ ফুলের পাপড়ি মেলে
জঠরে এবার তুমি এলে
দাবানলের আগুন হেলায়,
অঞ্জলি দিই, ভোরের আলোয়

# ‘অস্তিত্ব’ নিরিখে বস্তুবাচক শিক্ষা পদ্ধতি

**মহ. মিনারুল হক**

**শিক্ষা ও দীক্ষা**

মানব জীবনায়নী বস্তুত্বের বাস্তবায়নে জীবনের প্রশ্নমালা বাছাই করণের প্রায়োগিক প্রজ্ঞাই হল শিক্ষা। যার উন্নয়নে মানবতার বর্তন সহজ সরল হয়। নব নব আবিষ্ক্রিয়া ঘটতে থাকে আর্থসমাজে। আর দীক্ষা হল সেই বর্তনের আমিত্বিক ভাবকল্প। যে ভাবকল্প সেই আমিত্বিক চেতনায় কর্মসূচি সহ পরিকল্পিত।

দীক্ষাহীন শিক্ষায় ব্যক্তি সত্তার ভেতর থেকেই বিষয়ে চেতনিক ক্রিয়া প্রয়োগ করে। ফলে তা ব্যক্তির ব্যক্তিকতার উর্দ্ধে যেতে পারে না। বিষয়গতক্ষেত্রে চেতনিক সাড়া হয় কেবলমাত্র উদ্ধৃতিবাচক অর্থাৎ সেখানে কোনো কাল পাত্র ক্ষেত্রিক বস্তুত্বের সাড়া পাওয়া যায় না। সত্তা তার ভেতর থেকেই তার ঈপ্সিত বিষয়কে দেখে। যা সম্যকভাবে দেখতে পায় না।

দীক্ষাসহ শিক্ষা লাভ করা মানেই বিষয়ের ক্রিয়ায় সত্তার বাইরে বেরিয়ে আসা। তখন আমিত্ব বিষয়কে সম্যকভাবে দেখে। ফলে তখন চেতনিক ক্রিয়া হয় নৈর্ব্যক্তিক। তার response তখন উদ্ধৃতিবাচক নয়, তা কালগতভাবে প্রতীতিবাচক অর্থাৎ ইতিবাচক। যেমন ইউরোপের ঊনবিংশের প্রারম্ভেই এই দীক্ষাসহ প্রায়োগিক প্রজ্ঞার রেনেসাঁ। যার ফসল শিল্প বিপ্লব। যা আর্থসামাজিক বর্তনকে সহজ করেছিল। তা অপরাজনৈতিক ক্ষমতার হাতে চলে যাওয়ার ফলে আপেক্ষিক বস্তুভোগে আর্থসমাজ ব্যর্থ হয়।

আর্থসামাজিক বস্তু চয়েস অর্থাৎ আর্থসমাজের আপেক্ষিক জীবন প্রযুক্তি নির্বাচনে ব্যক্তির সক্ষমতা লাভ শিক্ষার উপর নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে মূল্য প্রত্যয়ী মূল্যনীতি, অর্থনীতি, মুদ্রানীতি ও বিকাশনী ব্যবস্থাপনার প্রত্যয়নে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানে দীক্ষাসহ শিক্ষা বাস্তবতার সম্পাদনী কৃৎকলার প্রতিপাদনেই।

**শিক্ষার একাডেমিক অঙ্গন**

যে অঙ্গন selective curriculum নিয়ে গড়া প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র। সেই প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনের ছাড়পত্রে অর্থাৎ certificate এ যদি জীবন বস্তুত্বের সংযুক্তিকরণ না ঘটে অর্থাৎ দীক্ষাসহ শিক্ষা না হয়, তবে তা আর্থসামাজিক বিশেষণের ছাড়পত্র পায় না। যেমন মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন একাডেমিক শিক্ষা নিলেও সেখানেই তাঁরা সীমাবদ্ধ থাকেন নি। তাঁরা তাতে জীবন দর্শনের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আর্থসামাজিক আক্ষেপিক জীবন প্রযুক্তির আবিষ্ক্রিয়া ঘটিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়ন করেছেন। এক্ষেত্রে একাডেমিক অঙ্গনের শিক্ষা তখন আবহনী শিক্ষা। আর তা না হলে একাডেমিই তখন মানুষের মাথার বোঝা।

**শিক্ষার নন একাডেমিক অঙ্গন**

এই শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠানহীন। এখানে কোনো বাছাই করা curriculum থাকে না। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি ও ব্যক্তির দেহ প্রকৃতিই এর পাঠক্রম। এই ক্ষেত্রটি স্বাধীন ও ব্যক্তি নির্ভর। আর তাই এখান থেকেই মানব সভ্যতার সমস্ত আবিষ্ক্রিয়া ঘটেছে। বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে, ইতিহাসের দ্বার উদঘাটিত হয়েছে। এই শিক্ষার সূচনা হয় আমিত্ব জিজ্ঞাসা থেকে। আর আমিত্বিক প্রশ্ন অর্থাৎ জীবনের মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে মানুষ দাঁড়ালেই জীবন বস্তুত্বের আপেক্ষিক আর্থসামাজিক প্রযুক্তিটিও পেয়ে যায়। যেমন হযরত মুসার মিশরের আপেক্ষিক জীবন প্রযুক্তি, গৌতম বুদ্ধের জীবন দর্শন, হযরত মুহাম্মদের অখণ্ড জীবন প্রত্যয়িত আর্থসামাজিক জীবন বস্তুত্ব। কিন্তু এই সকল জীবনায়নী বস্তু প্রযুক্তি মানবতার হাত থেকে দানবতার হাতে পড়লেই সে গোটা ব্যবস্থাপনায় সংক্রমণ ছড়ায়। শিক্ষাসহ সকল অঙ্গনকেই দখল করে নিজের মত করে নেয়। লক্ষ্যনীয় যে, শিক্ষা একাডেমিক কিংবা নন একাডেমিক যে অঙ্গনের হোক না কেন শিক্ষাকে আবহনী বিশেষণেই বিশেষিত হতে হয়। তা না হলে শিক্ষা যদি ট্রাডিশনাল প্রাতিষ্ঠানিক হয়, তা তখন রক্ষেরই খল বাজিকর। যাতে আর্থসমাজ দীক্ষা বঞ্চিত ও বস্তুলক্ষ্য বিভ্রান্ত হয়।

**শিক্ষায় রক্ষণকামী সংক্রমণের পটভূমি**

যে আর্থসমাজের শ্রমক্ষেত্র শ্রম তত্ত্বাবধায়ক শ্রমিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে নেই, সেই শ্রমক্ষেত্র থাকে রক্ষণকামিতার হাতে বন্দি। পরিণামে শ্রমবিজ্ঞানের স্বাভাবিক সৃষ্টিশীলতার গতি হারিয়ে আর্থসমাজ কিষ্কিন্ধ্যা হয়ে যায়। রক্ষণকামিতা শ্রমবিজ্ঞানের সৃষ্টিশীলতার ভয়ের ম্যানিয়ায় হরেক রং বাহারি প্রটেকশনের দেওয়াল তুলে শ্রমবিজ্ঞানকে ঘিরে ফেলে। শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য আর্থসমাজের বিকাশ খাতে ব্যয় হয় না। উদ্বৃত্ত মূল্য রুদ্ধতায় শ্রমক্ষেত্র ক্রমশ তার কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঐ ক্ষেত্রের সংকোচন ঘটায়। আর্থসমাজের বিকাশ রুদ্ধ হয়। রুদ্ধতায় আর্থসমাজে শ্রেণি মানসিকতার সংক্রমণ ঘটে। ধন কুক্ষিগত হয় কয়েকটি পকেটে। অন্যদিক দারিদ্র্যের অন্ধকারে ছেয়ে যায়। কুক্ষিগত ধনের আবর্জনা নিয়ে বিলাস এবং দারিদ্র্যের নোংরা ঘাঁটা জীবন জীবনের মানে হারাতে থাকে। এই শ্রেণি সমাজের বাস্তবতায় তার নেপথ্যের কারণটি যাতে উদঘাটিত না হয় তার জন্য আর্থসমাজের মধ্যে সে নানা বিষয়ে বিকৃতির সংক্রমণ ছড়ায়। তার মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষাক্ষেত্র। শিক্ষাক্ষেত্র কেন? কারণ শিক্ষাক্ষেত্রই উদঘাটন করতে পারে আর্থসামাজিক অশান্তির নেপথ্যের বাজিকরকে। আর্থসমাজের আনাচে কানাচে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। শিক্ষা সেই ঘটনাগুলিকে একসূত্রে গেঁথে মানুষের সামনে তার শত্রুমিত্রকে খাড়া করে দিতে পারে। মানুষকে প্রাণিত করতে পারে আর্থসামাজিক কুরুক্ষেত্রে সেই বাজিকরকে পরাজিত ও বন্দি করতে। এজন্যই শিক্ষা এত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই ক্ষেত্রকে কব্জা করা জরুরী। শিক্ষাক্ষেত্র দখল করে আসলে সে মানুষের মগজ দখল করে। এখন আমরা দেখব এই ক্ষেত্রে তার সংক্রমণের বিকৃতরূপটি কেমন এবং তার থেকে বেরোনোর শিক্ষা পদ্ধতিই বা কেমন হতে পারে।

**রক্ষণকামী শিক্ষা পদ্ধতি**

রক্ষণকামী ক্ষমতার শাসনে আজকের শিক্ষার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ স্তর, বিশ্ববিদ্যালয় স্তর, গবেষণাস্তর, বৃত্তি শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে তার স্লো-পয়জন ঢুকিয়ে ছাত্রদের মগজ ধোলাই করে নিজের শাসনের সাম্রাজ্যকে বহাল তবিয়ত রেখেছে।

আমরা যদি উক্ত শিক্ষাস্তরগুলির পাঠক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গি, গবেষণার বিষয়ে একটু তলিয়ে দেখি, তাহলেই দেখতে পাব যে কীভাবে সেগুলি মানুষের জীবনকে খণ্ড খণ্ড করেছে। সেখানে সমাজ জীবন, পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিজীবন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান সবকিছুই খণ্ডিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তার সাথে মানব জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই।

সেখানে ইতিহাস বলতে এক নেতিশক্তির থেকে আর এক নেতিশক্তি বা নাস্তিক্যের ক্ষমতা দখলের কাহিনি এবং সেন্টিমেন্টের সুড়সুড়িতে সম্প্রদায়গত শাসকদের ক্ষমতা দখলের দায় দোষারোপী নানান কেচ্ছার গালগপ্প।

যেমন –

১। গুপ্তযুগ। যে যুগকে রক্ষণকামিতা নাম দিয়েছে স্বর্ণযুগ। অথচ সেই যুগেই প্রাচীন ঋষি প্রদত্ত যে বক্ষ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতিকে সে এতটাই ভয় পেল যে, এই গুপ্ত যুগে সেই শিক্ষা প্রকৌশলে ঢুকিয়ে দিল বর্ণাশ্রমের কাহিনি।

২। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ। যে বিদ্রোহে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে সারা ভারতে ব্রিটিশ বেনিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাল। সেই গণবিদ্রোহকে আড়াল করতে রক্ষণকামিতা নাম দিল সিপাহি বিদ্রোহ।

৩। ব্রিটিশ বেনিয়াদের সমূলে উচ্ছেদে যুগনায়ক নেতাজি ব্যক্তি স্বার্থ ত্যাগ করে যে মানবিক সংগ্রামের ডাক দিলেন তিনিই কিনা হলেন দেশের শত্রু। আর বর্তমান শিক্ষা পাঠক্রমে যার কোনোই উল্লেখ রইল না। গোটা পাঠ্য ইতিহাস জুড়ে কেবল ইংরেজদের দাঁড় করানো ভূয়ো নেতাদের তথাকথিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফিরিস্তি।

এই সকল কারিকুরি কেন করে সে? আমরা কি তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলি? তুলি না। অথচ রক্ষকথিত উল্লিখিত কাহিনিগুলি তো ইতিহাস নয়। ইতিহাস হল

সমকাল আর্থসমাজ বস্তুর বাস্তবায়ন। সেই সমকাল বাস্তবায়নের নায়ক নেতাজি রক্ষকথিত ইতিহাসে থেকে যান ব্রাত্য।

রক্ষণকামী শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞান সেখানে কেবলই জড়বিজ্ঞান। যাতে মানব দেহমনের বিভিন্ন হরমোনাল নিষ্ক্রমণ যে মানব জীবনের ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার কোনোই নিদর্শন আমরা দেখতে পাই না। মানব দেহকে চিকিৎসা বিজ্ঞান অন্যান্য প্রাণীর সাথেই এক করে দেখে। কিন্তু তারা একটুও ভাবল না যে মানব দেহে চেতনা বা মন রয়েছে। যার অনুভূতিতে সে ঐ সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হয়। অন্য প্রাণীর সাথে মানবদেহ এক হলে তারা কোনো গবেষণার ভাবনা আনতে পারে না কেন। মানুষের তুলনায় তাদের দেহ শক্তি ও মস্তিকের আকার তো অনেক বেশি। এর কোন জবাব রক্ষের নেই।

আর দর্শন রক্ষণকামিতার হাতে পড়ে কথার বা যুক্তির জন্য যুক্তির(!) কচকচিতে দাঁড়িয়েছে। যেখানে সমস্যার মীমাংসাবাচক কোনো দিশা নেই। আর যে সকল জীবন দিশারি বস্তুতত্ত্ব রয়েছে, তাকে সে তথ্য রূপ দিয়ে রূপকথার কাহিনিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরের শিশুর ব্রেন ওয়াশ করতে শুরু করেছে (যেমন রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণের তত্ত্বকে তথ্য তথা কাহিনি রূপ সাজানো।) । কিন্তু বস্তুগতভাবে যদি আমরা দেখি তবে দর্শন হল মানব জীবন নির্বাহের অখণ্ড জীবন প্রত্যয়ী গাইডলাইন। যে গাইডলাইন মেনে মানুষ ব্যক্তিগত ও আর্থসামাজিক জীবনায়নের জীবন দিশা ও প্রযুক্তির বাস্তবায়ন করতে পারে।

রক্ষণকামিতা সবচেয়ে বেশি কাঁচি চালিয়েছে অর্থনীতিতে। সেই কাঁচির কাটছাট করা অর্থনীতির পাঠক্রম শিক্ষাঙ্গনে নিয়ে এসেছে। সেখানে শ্রম ও মূল্যের বিষয়টিকে পুরো অন্ধকারে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এমনভাবে অর্থনীতির বিষয়গুলিকে সে পেঁচিয়েছে যে মানুষ যেন তার কোনো রুট খুঁজে না পায়। যে অর্থনীতি থেকে মানুষ বাজার কীভাবে চলে, পণ্যের দাম কেমন করে নির্ধারিত হয়, চাহিদা ও যোগানের মধ্যের সম্পর্ক কী, পর্যাপ্ত উৎপাদন সত্ত্বেও যোগান ঘাটতি কেন হয়, দামের লোকালাইজড fluctuation বা কেন— কোনো কিছুই ধরতে পারে না। সবই তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। গোটাটাই থাকে গভীর অন্ধকারে। এই সবকে সে কুণ্ডুলি পাকিয়ে কিম্ভূতাকার বানিয়ে নিয়েছে। যার থেকে একেক জন তথাকথিত অর্থনীতিবিদ একেক রকমের মতবাদ খাড়া করে। যা মানুষ তথা আর্থসমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠায় অক্ষম। অক্ষম শুধু নয় তা মানুষকে ধারণার গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়ে মারে।

অথচ আর্থনীতি তো কোনো শ্রুতি বিস্ময়কর জটিল বিষয় নয়। সম্প্রসারিত শ্রমক্ষেত্রে শ্রমিকের উৎপাদন ও উৎপাদিত মূল্যের বিভাজন, বিনিময় ও বিন্যাসের সামগ্রিক রূপরেখাই হল অর্থনীতি। যার বিষয় নির্বাচন, বিষয়সজ্জা, বিশ্লেষণী বিশদীকরণ ও বিশ্লেষণ শৈলি তো জটিল নয়।

সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে তথা পাঠক্রমে যেমন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলকে রেখেছে, তেমনি সে একই পংক্তিতে মাইকেল, বঙ্কিমকেও রেখেছে। সেখানে কারা মানবতার গান গেয়েছে আর কারা মানবতাকে বিষিয়ে দিয়েছে সাহিত্যের মাধ্যমে তার কোনো পৃথকীকরণ নেই। যেমন মাইকেল মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রাবণকে নায়ক রূপে দেখিয়ে রামায়ণের বিরুদ্ধে তথা মানবতাকে লাঞ্ছিত করেছেন। শিল্প, অশিল্প বা অপশিল্প সবকেই ঠাঁই দিয়েছে সাহিত্য নামে। যে সাহিত্য মানব জীবনের সমস্যা মোচনে মানুষকে প্রাণিত করে না তা কি কখনো সাহিত্য হতে পারে?

আর যারা এই পাঠক্রমের ঐ সকল বিষয়গুলি ছাত্রদের সম্মুখে আলোচনা তথা বিশ্লেষণ করে, তারাও ঐ ধরনের পাঠ্যক্রমিক শিল্প ও অপশিল্পের থেকেই একাডেমিক শিক্ষা নিয়েছে, তাই তারাও সাহিত্যের কোনগুলি জীবনকে বিকশিত করে আর কোনগুলি সংক্রামিত করে তার পৃথকীকরণ করতে পারে না। তারা শুধু সমাজকেই দেখতে পায়। ব্যক্তিজীবনকে দেখতে পায় না। রক্ষ আবার এমনকিছু ব্যক্তিকে সাহিত্য জগতের সম্রাট নামে অভিহিত করেছে, যার থেকে তারাও বেরুতে পারে না। শিক্ষকবৃন্দ মানবতা

ও দানবতা নিরিখে সাহিত্যের শনাক্তকরণে ব্যর্থ। কারণ তাদের সেই চেতনিক দৃষ্টি তারা গড়ে তুলতে পারেন নি। যেমন ভাষা সাহিত্যের আলোচনায় একটি উদাহরণ দেয় যে, লোকটি গরিব হলেও সৎ। অর্থাৎ কিনা গরিব মাত্রই অসৎ। ধনীরাই কেবল মাত্র সৎ হয়। বিকৃত কুহেলিকার কি মসৃণ উদাহরণ। ফলে রক্ষের চিকন দাসত্বেই নিজেকে এক একটা পণ্ডিত ভাবতে থাকে। আর ব্যক্তি নিজেকে যেভাবে গঠন করে, আর্থসমাজকেও সেই একই বিশেষণে বিশেষিত করে। সেই বিশেষণ ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক দুই হতে পারে। ইতিবাচক হলে আর্থসমাজ গতিশীল হয়। আর নেতিবাচক হলে রুদ্ধ হয়।

কারিগরি, বৃত্তিশিক্ষা, মেডিক্যাল ও গবেষণা শিক্ষা রক্ষণকামিতার হাতে কব্জাকৃত হয়ে যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। সেখানে মানব জীবনের সাথে কোনো লিঙ্কই নেই। যার ফলে ঐ সকল শিক্ষা নিয়ে আজ অনেকে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত হলেও এক একটা যন্ত্র মানবের রূপ নিয়েছে। মন ও অনুভূতি শূন্য পাঠক্রমে তাই হয়। যার ফলে তারা জড় ভোগে জড় উপকরণের মধ্যেই জীবন ভোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু জড়ভোগ তো আপন চেতনা ভোগের স্বাদ দিতে পারে না। তারা প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও হতাশায় ভোগে, বিকৃতিতে পড়ে জীবনকে করে তোলে বিষময়। যার পরিণামে পরিবার, ছেলে মেয়ে নিয়ে চরম অশান্তির আগুনে জ্বলতে থাকে। অনেকে আত্মহনন তথা আমিত্বহনন করে।

অতএব রক্ষণকামী শিক্ষা পদ্ধতির (পাঠক্রম, শিক্ষা প্রক্রিয়া, শিক্ষক প্রভৃতি) মধ্যে ছাত্ররা নিজের জীবনে চলার পথনির্দেশনা পাচ্ছে না, কর্মসংস্থান পাচ্ছে না। জীবনে কোন বিষয়গুলি তার অস্তিত্ব বিকাশের সহায়ক এবং কোনগুলি তার জীবন প্রতিবন্ধক, তার সে মেরুকরণের শিক্ষা পাচ্ছে না। এই শিক্ষা পাঠক্রমে রাম-রাবণ, আলেম-জাহেল, দুর্গা-কালি, রবীন্দ্র-বঙ্কিম, নেতাজি-গান্ধিজি প্রমুখ সবাই এক। বস্তু-অবস্তু, ভালো-মন্দ, আলো-আধাঁর এর পৃথকীকরণ থাকে না। পৃথকীকরণ ঘটিয়েই আর্থসমাজে মানবাধিকারভিত্তিক আপেক্ষিক জীবন প্রত্যয়ী প্রযুক্তি গড়তে হয়। যার শ্রমক্ষেত্র হবে স্বাধীন। মানুষ তার পরম লক্ষ্যগত আমিত্ব বিকাশে শ্রম প্রয়োগ করে আবশ্যিক রেখে উদ্বৃত্তকে আর্থসমাজে অর্পণ করবে। যাতে শ্রমক্ষেত্র ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকবে। আর সেখানে উদ্বৃত্তমূল্যে কেন্দ্রীভূত আর্থসামাজিক সম্পদের হেফাজত থাকবে শ্রম তত্ত্বাবধায়ক শ্রমিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে। সেই আর্থসমাজের একাডেমিক শিক্ষা পদ্ধতি হবে বস্তুবাচক বিকাশনী শিক্ষা পদ্ধতি। কিন্তু রক্ষণকামী শিক্ষা প্রকরণে শিক্ষা সংসদের ভূমিকা সংকুচিত করে ক্ষমতাসীন দলগুলি শিক্ষানীতি, পাঠক্রম প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনধিকার দখল বজায় রাখে। যার পরিণামে উল্লিখিত বিষয়গুলি আরো জটিল রূপ নেয়।

**বস্তুবাচক শিক্ষা পদ্ধতির প্রস্তাবনা**

এই শিক্ষা পদ্ধতির লক্ষ্য হবে ছাত্রদের সামনে বস্তু ও অবস্তুর স্পষ্ট মেরুকরণ রেখে তাদের জীবনকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার বিকাশনী শিক্ষা। এখানেও প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর ভিত্তিক পড়াশোনা থাকবে। গবেষণা হবে জীবনের মৌলিক বিষয়ের সংকট মুক্তির আপেক্ষিক প্রযুক্তি নির্মাণের ভিত্তিতে। এখানে কেবলমাত্র একাডেমিক শিক্ষা নয় নন-একাডেমিক শিক্ষাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিক্ষার মানদণ্ড হবে আর্থসামাজিক বিকাশে তা কী ভূমিকা রাখছে তার উপর। তা সেটা একাডেমিক হোক বা নন-একাডেমিক।

**প্রাথমিক স্তর**

শিশু শিক্ষার মূল ভিত্তি হবে খেলার কৌশলে শিশুর চাওয়াগুলিকে মার্জিত রূপদান করা। শিশুর সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক হবে স্নেহ-ভালবাসা সহ দায়িত্ব-কতর্ব্যে বন্ধুত্বসম। একটি ক্ষণেও যেন শিশু বিরক্তি, অস্বস্তি, যন্ত্রণা, ভয়-ভীতি অনুভব না করে। শিশু পাঠক্রম হবে মনোগ্রাহী সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম হাস্য-কৌতুক, আনন্দ উচ্ছল ও মার্জিত ভাষা সমৃদ্ধ। হিংসাত্মক, ভয়াল, পৈশাচিক, নিষ্ঠুর, অতীন্দ্রিয় (ভূত-প্রেত বিষয়ক), চৌর্যবৃত্তিক প্রভৃতি কোনো বিষয় যেন কোনওভাবে পাঠক্রমে স্থান না পায়। সহজ সরল ভাষা ও শৈলীতে পাঠক্রমে ভাষা (কেবলমাত্র মাতৃভাষা), গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান (পরিবার, প্রতিবেশি,

বন্ধু, আত্মীয়, সহপাঠী প্রভৃতির পরিচয় ও সম্পর্ক), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কবিতা, ছড়া, সংগীত, খেলাধূলা, শরীরচর্চা প্রভৃতি বিষয় থাকবে। এখানে শিশুর সুকুমার বৃত্তিগুলির শনাক্তকরণ করতে হবে। শিশু কোন বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে, তা শিক্ষক ও তার অভিভাবকদেরকে নির্ধারণ করতে হবে। যাতে পরবর্তী স্তরে সেগুলির আরও বিস্তৃত ও গভীরভাবে চর্চা করা যায়। শিক্ষার মাধ্যম হবে অবশ্যই মাতৃভাষা।

এখানে যারা শিশুর শিক্ষক থাকবেন, তাদের শিক্ষা বিষয়ক জ্ঞান হতে হবে বস্তুবাচক। অর্থাৎ পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে ইতিবাচক ও বিকাশশীল মনন সমৃদ্ধ। তারা পরিচালনশীল মুক্তাঙ্গন ব্যবস্থা গড়বেন।

**মাধ্যমিক স্তর**

প্রাথমিক স্তরে শিশুর মধ্যে যে সকল সুকুমার প্রবণতা থাকে এবং যেগুলিতে শিশু নিজেই খুবই আগ্রহী সেগুলির বিশদ চর্চার ক্ষেত্র হবে মাধ্যমিক স্তর। সাথে সাথেই শিশুর দেহমানসিক যে সকল পরিবর্তন আসে এই বয়সে তার বিকাশের পরিবেশ ও পাঠক্রম থাকবে এই স্তরে। যেমন নৃত্য, সংগীত, কবিতা, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এবং দেহবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শ্রমবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ভাষা সাহিত্য, পরিবেশ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, যৌনবিজ্ঞান প্রভৃতি।

উক্ত বিষয়গুলি শিশুর সাথে, পরিবারের সাথে, সমাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে, অধিকারনীতিতে দায়িত্ব-কর্তব্যের সাথে কীভাবে সংশিষ্ট ও সংযুক্ত তার উল্লেখ থাকবে। শ্রম, মূল্য, মূল্য বিভাজন, মূল্য বিনিময় এবং উদ্বৃত্ত মূল্য প্রভৃতি কী ও তার বিন্যাসনী ব্যবস্থাপনা কেমন হবে তার রূপরেখা থাকবে এই পাঠক্রমে।

আজকের শিশু আগামীর নাগরিক। অতএব শিশু পাঠক্রমে উল্লেখ থাকবে চেতনা-অনুভূতির কোন বিষয় শিশুর জীবনকে সঞ্জীবিত, সৃষ্টিশীল প্রেরণা দেয় এবং কোনগুলি তাকে তথা আর্থসমাজকে বাধা দেয় বা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আসে। শিশু তার জীবন গঠনে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করবে এবং অবাঞ্ছিত বিষয় থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তা করতে গেলে শিশুদের যে যে চর্চার মধ্যে থাকা প্রয়োজন তারও ব্যবস্থা থাকবে।

**উচ্চ মাধ্যমিক স্তর**

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা পূর্বের স্তরে যে সব বিষয়ে নিজেদের পারদর্শিতা দেখাতে পেরেছে, সেগুলির মধ্যে একটি বিভাগ বেছে নেবে। এবং সেই বিষয়ে এই পর্যায়ে আরও গভীরভাবে জানার ব্যবস্থাপনা থাকবে এই স্তরে। এখানে ভাষাও থাকবে একাধিক। তা তারা নিজেদের সাবলীলতা অনুযায়ী গ্রহণ করবে। এখানে দেহবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জীবন নির্বাহী বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য বিজ্ঞান এবং যুক্তিবিজ্ঞান সংযুক্ত থাকবে। একটি বিভাগ নিলেও কিছু বিষয় তার আবশ্যিক থাকবে।

অর্থাৎ এই স্তরে শিক্ষার্থীর দেহ-মন-শ্রম-দাম্পত্য-সৌন্দর্য প্রভৃতি কীভাবে তাকে প্রভাবিত করে তা সে এখানে জানবে। আবার কী করে ঐ সকল বিষয়গুলি নেতিবাচক অনুষঙ্গে তার জীবনে বিকৃতির সংক্রমণ ঘটাতে পারে—তারও উল্লেখ থাকবে এই স্তরে। তার থেকে তাকে জীবন নির্বাহের ইতিবাচক দৃষ্টি গড়ে তোলার অনুপ্রেরণায় প্রাণিত ও সঞ্জীবিত করতে হবে, নেতিবাচকতাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে।

**কলেজ স্তর বা স্নাতক স্তর**

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আমরা যে সকল বিষয় সমূহের কথা বলেছি তার থেকে যে কোনো একটি বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর বুৎপত্তি অর্জনের ক্ষেত্র হল এই স্তর। অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে অবগাহন করা। এর জন্য বিষয়গুলির সাথে বর্তমান আর্থসমাজ কাঠামোয় তথা মানব জীবনের কোন কোন সমস্যা কোথায় কোথায় বাঁধা পড়ে রয়েছে তা চিহ্নিতকরণ। সেই সব সমস্যার সমাধান প্রযুক্তির সন্ধানে অগ্রসর হওয়া। জীবন সমস্যার সমাধান, বিষয়গত তথা একাডেমিক স্নাতক হওয়ার মধ্য দিয়ে করা যায় না। এর জন্য সত্তার অতল তলে ডুব দিয়ে সত্তা মন্থন তথা অবগাহন করে অমৃত অর্থাৎ সমস্যা সমাধানী প্রযুক্তি নিয়ে উঠে আসতে হয়। তবেই বস্তুগতভাবে স্নাতক হওয়া যায়। এই প্রযুক্তি আপেক্ষিক এবং তা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে স্বতন্ত্র হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্যের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

চিকিৎসা, কারিগরি বিজ্ঞান, বৃত্তিশিক্ষা, শ্রম বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক টেকনিক্যাল বিষয় থাকে। সেগুলি অবশ্যই সার্বিকভাবে জানা ও তাতে দক্ষ হওয়া দরকার আছে। কিন্তু সেটাই এই শিক্ষার শেষ নয়। এর সাথে সত্তা অবগাহিত চেতনা অনুভূতির ব্যালান্স থাকাটা আরও বেশি আবশ্যক। না হলে ঐ সকল যান্ত্রিক শিক্ষা মানব জীবনকেও যন্ত্রে পর্যবসিত করবে। ফলে সেখানে জীবন কুসুমিত না হয়ে বিকৃত হয়ে যায়। যে বিকার থেকে নানান দুর্বৃত্তি ও অপঘটনার সংক্রমণ ছড়ায়। যা মানব জীবন বিকাশে তথা অস্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী।

**স্নাতকোত্তর স্তর বা গবেষণা স্তর**

স্নাতক স্তরে অর্থাৎ সত্তা মন্থিত চেতনায় উত্থিত সংকট মোচনী আপেক্ষিক প্রযুক্তির মধ্যে থেকে সর্বোত্তম প্রযুক্তি নির্বাচন ও তার বিন্যাসনী রূপরেখার চিত্রায়নের আয়োজনই হল স্নাতকোত্তর এবং গবেষণার শিক্ষা স্তর। গবেষণার মধ্যে থাকবে ঐ প্রযুক্তির প্রয়োগ কৌশলপন্থা অনুসন্ধানী এষণার আয়োজন। যা মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রয়াস থাকবে এই স্তরে যা মানব জীবনকে আরও সুন্দরের দিকে নিয়ে যাবে।

বিষয়টি কেমন?

বিষয়টির বিশ্লেষণে আমরা যদি একটা উদাহরণ নিই তবে পরিষ্কার হয়। ধরা যাক, আর্থসমাজের 'বেকার সমস্যা'। এই সমস্যার সমাধানে ৫০ জন ছাত্র ১০ টি প্রযুক্তি দিয়েছে। এখন এই স্তরে ঐ ১০টি আপেক্ষিক প্রযুক্তির মধ্যে তুলনামূলক সবচেয়ে কার্যকরী প্রযুক্তিটির নির্ধারণ । আর সেই প্রযুক্তি বাস্তবায়নের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনার রূপরেখা কেমন হবে, কোন চরিত্রের নেতৃত্ব ঐ প্রযুক্তির রূপায়ণ ঘটাতে পারে এবং তার প্রয়োগিক বিন্যাস কেমন হবে?—তা গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত করা। এখানে সমস্যা উত্তোরণী লক্ষ্য থাকবে যেন সকল মানুষ কাজ পায় এবং প্রযুক্ত শ্রমমূল্য সঠিকভাবে পায়। লক্ষ্যগত স্থির সিদ্ধান্ত মানব জীবন বিকাশী না হলে কিন্তু গবেষণা বস্তুবাচক না হয়ে জড়বাচক হয়ে যায়।

একটি মাত্র সমস্যার কথা বলা হল। এই রকম অন্যান্য জীবন সমস্যার সমাধানী কৌশলের গবেষণা চলতে থাকবে। তা কেবল মাত্র এই রকম গবেষণায় নয়। তা সাহিত্য, কবিতা, গান, নাটক, সংগীত, চিত্রশিল্প প্রভৃতির শিল্পকলার মধ্যে দিয়েই উপস্থাপন এবং তার দিশাবাচক পথরেখার ইঙ্গিত প্রদান করা যেতে পারে। যা আর্থসমাজ তথা মানব জীবনকে ক্রমোন্নতির সোপান রচনাতে সৃষ্টি মুখর করে তোলে।

**বস্তুবাচক শিক্ষা পদ্ধতি ও দেহমানসিক শ্রম**

বস্তুবাচক একাডেমিক অঙ্গনে কেবল মাত্র পুঁথিগত শিক্ষা থাকবে না। ১। শিক্ষা সংসদ বিভিন্ন স্তরে পাঠক্রম প্রণয়নে অধিত বিদ্যা যাতে আর্থসামাজিক শ্রমক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা পায় সে দিকে নজর দেবে। ২। আর্থসামাজিক প্রযুক্ত শ্রমের উৎপাদন অর্থাৎ মূল্য বিভাজনী নীতি সেই শিক্ষাক্রমের একটি অবিভাজ্য অঙ্গ হবে। যেখানে আবশ্যিক ও উদ্বৃত্তমূল্য যথাযথভাবে বিন্যস্ত হবার নীতিগত ও প্রায়োগিকতাসহ শিক্ষার্থীর মননে সম্পৃক্ত হয়। ৩। দেহ ও মানসিক শ্রমের সম্পর্ক স্থাপনে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত দেহ শ্রম ভিত্তিক শিক্ষা পাঠক্রমও সংযুক্ত হবে। তা ছাত্রদের বয়স অনুযায়ী নির্বাচিত হবে। যেমন শরীরচর্চা, খেলাধূলা, শিক্ষা প্রাঙ্গনে বিভিন্ন ফসলের চাষ, বাগান নির্মাণ, গৃহস্থালির বিভিন্ন কর্ম প্রভৃতি সকল ধারাবাহিকক্রমে রাখা হবে। কেননা মানসিক শ্রমের সাথে শারীরিক শ্রমের ব্যালান্স না থাকলে দেহশ্রম হীনমন্যতায় ভোগে, আর মস্তিষ্ক শ্রম হীনমন্য-শ্লাঘামন্যতায় ভোগে। এক কথায় ব্যক্তির মানসরক্ষণকাম ও মানস বন্দিত্ব উৎসাদনে এই ব্যালান্স অতীব প্রয়োজনীয়। আর এই ব্যালান্স থাকলে শিশুর তথা ব্যক্তির দেহমন সুস্থ, সবল, উৎফুল্ল ও সতেজ থাকে।

**শিক্ষা সংসদ**

শিক্ষা সংসদের ভূমিকা এই শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বের। এজন্য রাজ্যের দায়িত্ব থাকবে রাজ্য শিক্ষা সংসদ, জেলার দায়িত্বে জেলা শিক্ষা সংসদ এবং ব্লকে ব্লক শিক্ষা সংসদ। সংসদ সকল শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন—admission, teaching process, infrastructure, curriculum forma-

tion, examination, evaluation, teacher recruitment—প্রভৃতির ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্য দিয়ে করবে। ঐ সকল বিষয়গুলি সবই সংসদীয় আলোচনা তথা conference এ প্রস্তাবিত ও সমালোচনার প্রেক্ষিতেই নিরূপিত হবে। বিভাগীয় সকল সদস্যই তাদের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করবে এবং সকলেই সেক্ষেত্রে সমান ক্ষমতার অধিকারী হবে। তাদের গঠন ও মেয়াদ ২ বছরের বেশি থাকবে না। সেখানে রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, সাহিত্যিক, গবেষক, শিক্ষক, অভিভাবক প্রমুখের থেকে শিক্ষা সংসদের সদস্য নেওয়া হবে। শিক্ষা পরিচালনে শিক্ষা সংসদের নির্বাচন ও তার কার্যনির্বাহীতা ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীনভাবে সম্পাদিত হতে হবে। এই সকল সংসদ সমকালীন রাজনীতির প্রেক্ষায় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে সচেষ্ট থাকবে। সরকার আর্থিক দায়-দায়িত্বেই তার ভূমিকা সীমায়িত রাখবে। শিক্ষা সংসদ স্বাধীনভাবে শিক্ষার মূল লক্ষ্যের নিরিখে তাদের কর্মসূচি রূপায়ন করবে ।

বস্তুবাচক শিক্ষা পদ্ধতির রূপরেখায় আমরা দেখাতে চেয়েছি যে, শিক্ষায় ব্যক্তি নিজেকে এবং আর্থসমাজকে যেন পরিষ্কার ঝকঝকে রূপে দেখতে পায়। বিকাশনী শিক্ষা গ্রহণে নিজ নিজ জীবনে চলার দিশাবাচক জ্ঞান তথা গাইডলাইন পায়। সেই দিশা লক্ষে নিজেকে গড়তে পারে। নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে। সেই সৃষ্টিই আর্থসমাজকেও প্রভাবিত করতে পারবে। তা হলে শিক্ষা হবে সমাজ বিকাশের বাহন। কারো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা নয় কিংবা কারো কাছে মাথার বোঝা নয়। আর একটা কথা এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই শেষ কথা নয়। তার বাইরের শিক্ষাও ঐ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। যখন তা বস্তুবাচক শিক্ষা হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি যে বিকাশনী শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দীক্ষাবাচক প্রযুক্তির নির্ধারণে আর্থসমাজরথ গতিশীলতা লাভ করে থাকে। আরও একটি কথা উল্লেখ্য যে রক্ষকবলিত আর্থসমাজে এই শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আসা দুরূহ। তাকে পরাজিত করে শ্রম তত্ত্বাবধায়ক নৈর্ব্যক্তিক শ্রমিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে আর্থসমাজের পুনর্গঠনেই বস্তুবাচক শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ সহজ সরল।

---

# অন্ধকার গহ্বর

**মীর সাহেব হক**

প্রতিদিন রাত্রির মতো গভীর হয়ে উঠছে দেশ
নদির দুকূল ছাপিয়ে যে জল বয়ে যায়
এই উঠোনে, ঘর বারান্দায় শ্যাওলা জমে
কোন অবাধ্যতার পাপে মুড়িয়ে
ইয়াজুজ মাজুজের মতো পাহাড় চেটে যাচ্ছি
অন্ধকার গহ্বর, ফেরাউনী রাজ, সেই একই সকাল!
দাঁতে দাঁত কেটে ক্ষয়ে যাচ্ছে দাঁত
ঝুলে পড়েছি সময়ের ফাঁসে!
শেয়ালী রাত্রির খেয়ালিতে
সূর্য নেই, দিন যায় জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে

# ওষধি গুণ সম্পন্ন লাল ও কালো চাল

**অনুপম পাল**

ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। চালের উপরে থাকে পাতলা খোসা বা তুষ। অথচ জানেন কি এই খোসা ছাড়ানো চকচকে প্যাকেটের চালই আমাদের রোগভোগের অন্যতম কারণ! চালের উপরের পাতলা খোসা (ব্রান) পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। বড় রাইস মিলে ধান ভাঙানোর সময় উপরের এই খোসা পালিশ করে দেয়া হয়। কারণ পুষ্টিগুণ থাকুক বা না থাকুক সরু স্বচ্ছ ধরনের চালের চাহিদা বেশি। বেশির ভাগ ক্রেতারা এটি নিয়ে চিন্তিত নয়। দৃষ্টি নন্দন প্যাকেট বন্দি চকচকে পালিশ করা সরু চালে পুষ্টিগুণ প্রায় ষাট ভাগ বেরিয়ে যায়। বেশির ভাগ ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফোলেট সহ অন্যান্য ভিটামিন বি, প্রোটিন এবং সম্পূর্ণ ভাবে ফাইবার, তুষের সঙ্গে থাকা অত্যন্ত উপকারী ও পুষ্টিকর তেল (ব্রান তেল) ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই জন্যই তুষ জ্বালানীর কাজে লাগে। এখন তুষ তেলও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। ইদানীং প্রায় পুষ্টিবিহীন এই চালের মধ্যে থাকছে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক বিষের অবশেষ। কিছু জায়গায় ভারী ধাতুও। খালি চোখে চাল দেখে কিছুই বোঝা যাবে না। লক্ষ্য করেছেন এখন মানুষের রোগভোগ কত বেড়েছে ! ক্যানসার এখন আর বিরল নয়। ডায়বেটিস, স্নায়ুর গোলযোগ, শারীরিক দুর্বলতা প্রায় প্রত্যেক পরিবারে। ভুগছে শিশুরাও। খাবারটাই এখন আমাদের শত্রু। ইদানীং বিষমুক্ত খাবার নিয়ে চর্চা হচ্ছে।

দেশ বিদেশে লাল ও কালো চালকেই বেশি পুষ্টিকর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগে আউশ ধানের চাষ হত বহু জায়গায়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে কাটা হত। বেশির ভাগ আউশ ধানের চালের রঙ লাল। আমনেরও অনেক চালের রঙ লাল। তখন ঢেঁকিতেই ধান ভাঙানো হত এবং কিছুটা খোসা উঠে যেত, খসখসে লালচে ধরনের চাল মানুষ খেতেন। এটাই সাহেবদের কথায় ব্রান রাইস। পরে তা ব্রাউন রাইসে পরিবর্তিত হয়। সেই হিসাবে খোসা সমেত, পালিশ না করা চালকেই ব্রাউন রাইস বলা হয়। তবে পালিশ না করা চাল বলাটাই যুক্তিযুক্ত। লাল, হালকা হলুদ, সাদা, হালকা লাল, কালচে, লাল– এই সব চালই এর আওতায় পড়ে। গর্ভবতী মায়েদের ফেন-ভাত খাওয়ার চল ছিল এবং এর মাধ্যমে লোহা ও ফলিক অ্যাসিডের চাহিদার অনেকটাই মিটত। এখন ওষুধের দ্বারা মেটানো হচ্ছে। কয়েকটি লাল চাল হল– ষাটিয়া, শালকেলে, কেলে আউশ, কেলাস, ভুতমুড়ি, কয়া, অগ্নিবান, দোরাঙী, লাল দুধের সর, খাড়া ইত্যাদি। পালিশ না করা চাল শপিং মলে ব্রাউন রাইস নামে পাওয়া যায়।

কালো চালের কথা শুনে অবাক হচ্ছেন! ঠিক ধরেছেন। এটাই চালের রঙ। এরও অনেক জাত আছে। এটিসি ফুলিয়াতে সাতটি জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আদতে মহারাষ্ট্র অঞ্চলের রপ্তানি যোগ্য কালোচাল সুগন্ধি কালাভাত এখন পশ্চিমবঙ্গেও চাষ শুরু হয়েছে। এটিসি ফুলিয়া থেকেই এই ধানের বীজ ও চাষ রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ওড়িষ্যার সম্ভব সংস্থা থেকে ২০০৮ সালে প্রতিবেদক ওই চাল সংগ্রহ করেন। কৃষি দপ্তর এর প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে এসেছে। প্রায় সব জেলায় কৃষকরা এই ধান চাষ করছেন সম্পূর্ণ জৈব সারে এবং রপ্তানি যোগ্য পরিমানে উৎপাদন হচ্ছে যা গোটা দেশে একটি দৃষ্টান্ত। অন্যান্য দেশি ধানের মত এই ধান চাষের খরচ কম, বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি ঠিক হলে একই বীজ সারা জীবন চলবে, পাল্টানোর দরকার নেই এবং রোগ পোকার উপদ্রব খুবই কম। তেত্রিশ শতকের বিঘায় বারো-তেরো মন ফলন হয়। দামও ভালো। কিছু জায়গায় বিপণনের সমস্যা রয়েছে। মণিপুরে কালো চাল চাহাও জাতটি খুব প্রচলিত। আসামেও এখন পাওয়া যায়। কালো চাল অন লাইনেও বিক্রি হচ্ছে।

মোটামুটি ভাবে পালিশ না করা কালো ও লাল চাল অধিক অ্যান্টি অক্সিডেট, লোহা, জিঙ্ক, ফাইবার সমৃদ্ধ

এবং কম শর্করা যুক্ত। এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। মধুমেহ রোগীর পক্ষে ভালো। আনথোসায়নিন নামক অ্যান্টি অক্সিডেন্টের জন্য এই চালের রঙ কালচে লাল। এই চালকেই ওষধি গুণ সম্পন্ন চাল বলা হচ্ছে। চাল ধোয়ার পর আনথোসায়নিন সমৃদ্ধ সুগন্ধী জল বেরিয়ে আসে। দেখতে কালো হলেও কালো চালই বেশি পুষ্টিকর। শিশু ও রোগীর পথ্য। সাদা ভাতের সঙ্গে ওষুধ হিসাবে রোজ খাওয়া যেতে পারে। এক রাত ভিজিয়ে রাখার পর রান্না করতে হবে। উপরের লাল খোসা থাকার জন্য রান্না হতে দেরি হয়। প্রেসার কুকারে পাঁচ-ছয়টি সিটি দিলে ভালো হয়। আসুন সপ্তাহে অন্তত চারদিন পছন্দমত দেশি চাল ও দুদিন পালিশ না করা চালের ভাত খাওয়া শুরু করি।

কালাভাতের বৈশিষ্ট্য:

| | |
|---|---|
| চালের রং কালচে লাল | ভাতের রং কালো |
| ক্যানসার প্রতিরোধক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যৌগের উপস্থিতি | ফাইবার বেশি তাই অ্যান্টি ডায়াবেটিক |
| লোহা ও জিঙ্ক সমৃদ্ধ | ক্যানসার রোগীর আদর্শ পথ্য |
| ভাত আঠালো ও সুগন্ধী | পায়েশ, খিচুড়ী, ঘিভাত, আইস ক্রিম, পাস্তা, পাঁপড়, নুডুলস |
| শিশু ও রোগীর পথ্য | চাল ধোয়া সুগন্ধী লাল জল সিরাপ হিসাবে ব্যবহার। |

# ইন্টার্ন শিক্ষক – বিদ্যালয় শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রা

**কিংকর অধিকারী**

তাহলে কি স্কুল সার্ভিস কমিশন ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হতে চলেছে? কমিশনের চেয়ারম্যানকে দিয়ে যতই বলানো হোক যে, কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ চলতেই থাকবে। বাস্তবে ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগ হলে এসএসসি তার গুরুত্ব হারাবেই। শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রায় ছয় বছর ধরে যে টালবাহানা চলছে তা থেকে অনেকের আশঙ্কা তো ছিলই। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় সেই ইঙ্গিত বাস্তবায়িত হতে চলেছে। বিদ্যালয়ে যদি শিক্ষকের অভাব থেকে থাকে তাহলে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়? আসলে বিষয়টি সরকারের শিক্ষা নীতির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই ব্রিটিশ সরকারের আমল থেকে আমরা দেখে আসছি যে শিক্ষার দায়ভার সরকার কোনদিনই নিতে চায় না। নবজাগরণের মনীষীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কথাটি বারবার বলে এসেছিলেন সেটি হলো, শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্ত আর্থিক দায়ভার সরকারকে বা রাষ্ট্রকে নিতে হবে কিন্তু শিক্ষার সিলেবাস, পরিচালনা সহ সমস্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন শিক্ষাবিদগণ। এখন আমরা দেখছি সরকার শিক্ষার ব্যাপারে তার আর্থিক দায়ভার ক্রমশ চাপিয়ে দিচ্ছে অভিভাবকদের উপর। অথচ সুনিপুণভাবে শিক্ষার উপর ছড়ি ঘোরানোর কাজটা সরকার করে চলেছে।

রাজ্যের অধিকাংশ সাধারণ বাড়ির সন্তানরা সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। হাজার হাজার টাকা দিয়ে বেসরকারি স্কুলে পড়ার মত অবস্থা তাদের নেই। এমনিতেই বেশ কয়েক বছর ধরে বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে চলছে শিক্ষক সংকট। এসএসসি এর মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটি সচল করার পরিবর্তে ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগের পরিকল্পনা প্রচলিত বিদ্যালয় শিক্ষার ভিতকে নড়িয়ে দেবে। পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে শিক্ষিত বেকারদের খাটিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা আসলে সস্তায় সস্তা শিক্ষা! বাজারে বেশি দামে ভালো জিনিস, কম দামে খারাপ জিনিস পাওয়ার মতো। যেমন জিনিস তেমন দাম। প্রাথমিক শিক্ষার প্রায় অর্ধেক অংশ এভাবেই চলে গিয়েছে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের কবলে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে প্রাথমিকের নার্সারি স্কুল। অধিক অর্থ ব্যয় করে মানুষ বাধ্য হয়েছে সেই সব স্কুলে তাদের সন্তানদের ভর্তি করতে। দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলিত রেখে দেওয়ার পরিণামে এ কাজে সফল হয়েছিল শাসকেরা। তাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আজ প্রায় সমসংখ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাত্রাভাবের কারণ দেখিয়ে কলকাতা শহরের বুকেই প্রায় দুহাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারিভাবে এতদিন পর্যন্ত টিকে রয়েছে তাকেও বিভিন্ন অপকৌশলে বেসরকারি ব্যবসায়ীদের মুনাফা লাভের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এভাবেই নবজাগরণের প্রভাবে গড়ে ওঠা হাজার হাজার বিদ্যালয় আজ ধ্বংসের পথে। সরকার ক্রমশ তার আর্থিক দায়ভার নিজের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিচ্ছে।

সাধারণের কাছে উচ্চশিক্ষা নাগালের বাইরে গেলেও এতদিন পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষা ধরা ছোঁয়ার মধ্যে ছিল। কিন্তু উচ্চশিক্ষার মত বিদ্যালয় শিক্ষাকে 'ফেলো কড়ি মাখো তেল' -এই পর্যায়ে নামিয়ে আনা হচ্ছে। অর্থাৎ অর্থ যার শিক্ষা তার। যতটুকু জানি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হাতে কলমে শিক্ষার জন্য ইন্টার্নশিপ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে কীভাবে সেটি প্রযোজ্য বোধগম্য নয়। তবে এটি পরিষ্কার যে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে ধীরে ধীরে এই ইন্টার্ন শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে অল্প বেতনে নামমাত্র শিক্ষা দেওয়ার যে পরিকল্পনা রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। দু-আড়াই হাজার টাকার বিনিময়ে যে

দায়বদ্ধতার  শিক্ষা বিতরিত হবে তার গুণগতমান নিশ্চয়ই উপলব্ধি করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকবৃন্দ তাদের সন্তানদের জন্য অন্য রাস্তা খুঁজতে বাধ্য হবেন। আর্থিক দিক দিয়ে যারা সক্ষম হবেন তারা অধিক অর্থ ব্যয় করে ঝাঁ চকচকে বেসরকারি বিদ্যালয়ে সন্তানকে ভর্তি করবেন। ধীরে ধীরে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি রক্তশূন্য হয়ে পড়বে।

শিক্ষিত বেকারদের সামনে খুড়োর কল দেখিয়ে যৎসামান্য অর্থ দিয়ে খাটিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা শুধু অন্যায় নয়, অমানবিকও বটে। পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে ছিটেফোঁটা অর্থ দিয়ে পূর্ণ সময়ের মতো করে বেকারদের খাটিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা মধ্যযুগের অমানবিক বর্বরতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে দলীয় আনুগত্যই প্রাধান্য পাবে। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা যতটুকু তার মর্যাদা নিয়ে টিকে আছে তাও ভেঙে পড়বে।

গোটা সমাজ আজ বেকারত্বের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। একটা যেকোনো কাজের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিক্ষিত বেকার সম্প্রদায়। মাত্র দু-তিন হাজার গ্রুপ ডির পোস্টে পঁচিশ-তিরিশ লক্ষ শিক্ষিত বেকার চাকরির জন্য ফর্ম ফিল আপ করে। তাদের মধ্যে থাকে কেউ পিএইচডি, কেউবা এমএসসি সহ উচ্চ ডিগ্রিধারী! মাত্র দু-আড়াই হাজার টাকার বিনিময়ে কিনে নেওয়া হবে তাদের! তাদের কাছে এই ধরনের খুড়োর কল আসলে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার হীন অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই না।  ভবিষ্যতে সুদিনের মরীচিকায় লাইন দেবে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার। তাদের জন্য তৈরি হবে দলীয় এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক। বুকের যন্ত্রণা চেপে রেখে দলের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটতে থাকবে লক্ষ লক্ষ বেকার। একদিকে যেমন তাদের প্রতিবাদী মনটাকে মেরে দেওয়া যাবে, তেমনি বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে ভিখারির থেকেও কম বেতন দিয়ে খাটিয়ে নেওয়া যাবে।

এভাবেই শিক্ষার দায়ভার আমাদের কর্ণধারেরা ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। বেসরকারি মালিকদের হাতে শিক্ষা আজ মহার্ঘ পণ্যে পরিণত হচ্ছে। এই আসল সত্যটি যদি না আমরা উপলব্ধি করে সরকারের এই অপচেষ্টা রুখতে পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ বাড়ির সন্তানদের জন্য আর কোনো সরকারি বিদ্যালয় অবশিষ্ট থাকবে না।

## আই ওয়াশ

**রঞ্জন পাড়ুই**

‘ধর্মে’র মিশেলে জাতীয়তাবাদের বটিকা
ইন টু বিকাশের পাঁচ ফোড়ং ভায়া মিডিয়া
ইক্যুয়াল টু পার্লামেন্টারী গরিষ্ঠতা

সেয়ানার মুচকি হাসি আম্বানি-আদানির ঘরে
দিনে বাইশ শো কোটি মুনাফার গ্যারান্টি
আই ওয়াশ ডোকালাম-সিয়াচেনে

অলীক স্বপ্নের ডোর
বেঁধে ফেলে তারুণ্য
পশরা সাজায় মায়াবী ছলনার অহংকার

এবার যত পারো লাফ মারো
ঐতিহ্যের বাজনার তালে

লক্ষ্য-হারা যৌবন
খুঁটোয় বাঁধা, আর কত দিন !
প্রশ্ন জাগে, ইতিহাস তোমার ছেদ-বিন্দু কোথায়?

# ওরাও কাঁদছে

**অশনিকা ঋদ্ধি**

উনি আসবেন
শকুনি সাজাচ্ছে মঞ্চ
নিচে কালচে রক্তে
মাখামাখি মাটি

উনি অবতরণ করবেন,
সাদা ধপ ধপে পোশাক
হেলিকপ্টার ঘুরছে

সোঁ সোঁ ঘূর্ণি বাতাস
রাজবন্দনার মূহুর্মূহু ধ্বনি!
আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে
দানবীয় হুঙ্কার ছুটছে দশ দিকে

দিশেহারা জনগণ

নেতা নামবেন
কখন নামবেন? উদাস আর নিস্পৃহ চাহনি

বলাঙ্গীরে জন সভা

হেলিপ্যাডে চাপ চাপ রক্ত
আমাদের প্রপিতামহ সম দশহাজার বৃক্ষের রক্তে
আকাশের পশ্চিম কোণ রাঙা হয়ে উঠছে
কাঁদছে ওরাও

রক্তের দাগ কয়েক হাজার মিটার এলাকা জুড়ে

দোষ কার? বঙ্গোপসাগরে উঠলো ঢেউ
আছড়ে পড়লো উপকূলে
চাপান উতর
ঢেউয়ের চাপে বন দফতর দায়ী বলল
পি ডব্লিউ ডিকে

কান গরম হয়ে উঠল পি ডব্লিউ ডির
সে চাপাল
দায় বন দফতরের ঘাড়ে!
ঘুরে গেল হাওয়া
দোষ চাপলো রেল দফতরের ঘাড়ে

রেল দফতর বসালো দীর্ঘ মেয়াদী কমিশন

এর মাঝে নেতা আসবেন
পাকাপাকি হলো ঠিক

শোনাবেন প্রলাপী-বচন,
তাও নিশ্চিত
শুধু সাদা পোশাকে
মিশে যাবে কালচে রক্তের দাগ

দুর্যোধনী রাজ সভায় কমিশন বসবে কি কোনো দিন?

# ইন্টার্নশিপ ভিক্ষা

**অশনিকা ঋদ্ধি**

রাজা-রানির ছলনার জাদুকরী মায়ায় ফাঁদ
পাতা সংসার, বয়ে চলে গঙ্গা-যমুনার তির ধরে
নিয়তির মতো

ভেকধারী রাজনেতা দুর্যোধনী জাঁতা কলে
পিষে মারে যৌবনের দাবি
স্বপের চাওয়া

বেকারের স্বপ্নের দামে
সাদা কাফন ওঠে ইভিএমে,

রক্তের দাগ শুকোয় না, আসমুদ্রহিমাচল
জায়মান প্রাণ, ধুকপুক করে, শকুনি শোঁকে
রক্তের আঁশটে গন্ধ, কর্পোরেট-বাহুতে
নতুন পালক ওঠে
দাস প্রথা ফেরে নতুন ছকে

রসাতলে যায় কাজের ক্ষেত্র,  জোনাকি
পোকা গুলো আঁধারের সলতে, তাও
নিষ্প্রভ আজ

দিন সাল বছর গুণে গুণে পেরিয়ে যায়
পাটিগণিত বীজগণিতের সরল নিয়ম

নতুন অসুরে ধারাপাত চালু হয়েছে শেয়ালী
শেয়ানা  জঙ্গলে;
যৌবনের চোখে তাই সর্ষে ফুল ফোটে

সেই হলুদ বিবর্ণ ফুলই বদলে যেতে পারে

যুথবদ্ধ রক্ত জবা-ই

# একটা ছেলে

**প্রিয়া কর্মকার**

বছর দশ পেরোলে যার কাঁদতে মানা শেখানো হয় সে একটি ছেলে। একটা সময় পর নিজের হাত খরচটা চাইতেয় যাদের কেমন নিজেকে দ্বিধাগ্রস্ত লাগে সেও একটি ছেলে। কলেজের গণ্ডি পেরোলে স্বাধীন জীবনে যখন দায়িত্বের কোপ বসে আর সে নিজের ইচ্ছে বলি দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, রাতের পর রাত দুটো চোখ যখন প্রেম নয় একটা স্থায়িত্ব চায় নিজের, হ্যাঁ অবশ্যই একটা পুরুষ জীবন। মনে হতেই পারে আমি একটা মেয়ে তবুও ছেলেদের নিয়ে কেন এত কথা বলছি! কারণ একটা কাঁধ, সেটা আমার খুব পরিচিত যা আমাকে চড়িয়েছে, শহর চিনিয়েছে তা একটা পুরুষ কাঁধ, সেটা আমার বাবার। পুজোতে নতুন দুজোড়া জুতো এসেছে আমার জন্য যখন, তখন একটা পুরোনো জুতো ও পালিশ হয়ে আসত সেটাও ইচ্ছে বলি দেওয়া মানুষটার।

একটা সম্পর্কে অতটাও ভালোবাসা, দায়িত্ব বোধ থাকেনা যতটা একটা দাদার থাকে তার বোনের প্রতি। প্রতিটা খুনসুটি স্তব্ধ হয় যখন কাঁদতে না পারা ছেলেটা তার বোনকে বিয়েতে বিদায় সাজে দেখতে ব্যস্ত। যৌবনা হয়ে ওঠার সাথে সাথে সব মেয়েরেই একটা ভরসাযোগ্য হাত চায়, বেশি যদিও না তবে সেটা একসাথে বসে প্রেমের গোধূলি কাটানোর সময় ও একটা মানুষ চায় যার হাতে হাত রেখে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়।

একটা জীবন, আড্ডা বন্ধু সব ছেড়ে সন্তান পালনে নিজের সবটা দেয়, একটা জীবন যেখানে দুঃখরা অনায়াসে লুকিয়ে ব্যক্তিকে মিথ্যে হাসতে শেখায়, একটা সময় যা প্রেমিককে বাধ্য করে দিনরাত জাগিয়ে রাখতে, না! প্রেমের জন্য নয় একটা উপযুক্ত কাজ পেয়ে ভালোবাসাকে পূর্ণতা দেবার স্বার্থে। এক বাবা, এক ছেলে, এক দাদা, একটা প্রেমিক, কতগুলো সম্পর্ক আসলো না? এই এত দায়িত্ব যেখানে গিয়ে থমকে যায় একটা পুরুষে।

গল্প

# মহীন

**তানিয়া খাতুন**

জামিল এই মেস বাড়িতে এসেছে প্রায় চার মাস হল। মেসের মালিকের ব্যবহার মাই ডিয়ার টাইপের। উনি জামিলকে বেশ খাতির যত্ন করে দুই বেডের একটি রুমে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই রুমের তার বর্তমান রুমমেট মহীনদা।

তার সম্পর্কে মেসকাকু মসলামাখা কয়েকটি কথা বলায় জামিল খুব সহজেই এই রুমে থাকতে রাজি হয়ে যায়। এছাড়া ভাড়াটাও কম। কিন্তু এখন সমস্যা হলো, এতদিন পর্যন্ত মহীন দাদা জামিলের সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। এমনকি চোখাচোখি হলে সৌজন্যের হাসিটাও হাসেনি। ঘরের মধ্যে মশা মাছি আসলেও মানুষ এমন নির্বিকার থাকতে পারে না, সেখানে জামিল আস্ত একটা মানুষ। রুমমেটেরা গলা জড়াজড়ি করে, মুখ চোখ বেঁকিয়ে কিংবা অতিভদ্র হয়ে সোসাল মিডিয়াতে কত ছবি ছাড়ে, রুমমেটকে নিয়ে জামিল সেরকম আদিখ্যেতামূলক সম্পর্কের স্বপ্ন কোনোদিনই দেখেনি, কিন্তু স্বাভাবিক একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক জামিল অবশ্যই আশা করেছিল। বলতে গেলে মেসকাকুর ঐ মসলামাখা কথা শুনেই জামিল নিজের অজান্তে কখন যেন মহীনকে 'মহীন দাদা' বানিয়ে ফেলেছিল। মেসকাকুর মুখেই শোনা, মহীন দাদা অঙ্কে এমএসসি করেছে।

দাদার গানের গলাও নাকি খুব সুন্দর, কিন্তু জামিল মহীন দাদাকে কখনও গান গাইতেও দেখেনি। শুধু দেখেছে, দাদা সবসময় কী যেন ভাবে আর বিড়বিড় করে নিজের সাথে কথা বলে। এমন একটা ছেলে সারাদিন ঘরের মধ্যে বসে থাকে কী করে সেটাই ভাবার বিষয়। নাওয়া-খাওয়ার কোনো ঠিক নেই, মোবাইল ব্যবহার করতেও দেখা যায় না। জামিলের মাঝে মধ্যে মনে হয় সে একটা মৃত মানুষের সঙ্গে বাস করছে। মেসের কিছু ছেলে সন্দেহ করে মহীন দাদা নাকি নেশা করে, যাকে বলে Pure drug addicted। জামিল সে আশঙ্কার কথাও ভেবে দেখেছে, কিন্তু লাভ হয়নি। মহীন দাদা ওসব ছাইপাশ কিছুই খায় না।

মহীন কে দেখে জামিলের কেমন যেন মায়া লাগে। সে তাকে এড়িয়ে চললেও, জামিল কিছুতেই তাকে এড়াতে পারে না। জামিল মহীনের জন্য রাতের খাবারটা এনে টেবিলে ঢাকা দিয়ে বলল, 'দাদা খাবার ঢাকা থাকলো, খেয়ো নিও।' —কথার মধ্যে এই একটি কথাই জামিল মহীনের উদ্দেশ্যে রোজ খাবার আনার পর বলে। মহীন জামিলের কথাকে পাত্তা দেয় না। কিন্তু আজ মহীন জামিলের দিকে চেয়ে হাসল। বলল, রোজ রোজ তুমি আমার জন্য খাবার আনো কেন? তুমি আমার সংস্পর্শে এসো না। নিজের পড়াশোনা নিয়ে থাকার চেষ্টা করো।

জামিল: কেন, তোমার সংস্পর্শে আসলে কী হবে?

মহীন: তুমি আমার জগতে চলে আসবে, যা তোমার জন্য ক্ষতিকর।

জামিল: উল্টোটাও তো হতে পারে।

মহীন: দেখো, তুমি পারলে অন্য রুমে চলে যাও। আমার সাথে কেউ থাকতে পারে না, আমাকে পাগল ভেবে ভয় পায়। কিন্তু তোমাকে বলে রাখি, আমি পাগল নই, আমাকে যে কোনো অঙ্ক করতে দাও, আমি করে দেব। পাগলরা কখনও অঙ্ক করতে পারে না। আসলে আমি একটু অন্যরকম। আমি দিনরাত শুধু স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখি আর সুখে থাকি। ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এটাই সত্যি। যাইহোক, অনেক কথা বলে ফেললাম। তুমি কি ভয় পাচ্ছো?

জামিল: না দাদা। আমি এই ঘরে তোমার সাথেই থাকবো। আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

জামিল ছেলেটাকে মহীনের বেশ পছন্দ হয়েছে। এখনকার ছেলে মেয়েরা বেশ জটিল হয়, সহজে ধরা দিতে চায় না কিন্তু জামিল সেরকম না। ছেলেটার মধ্যে

সরলতা আছে। ছেলেটা ভালোবাসতে জানে। জামিলের চোখের চাওনি, হাসি, কথা বলা সব কিছুই যেন তুহিনের মতো। তুহিন মহীনের ছোট ভাই। মহীনের চোখের সামনে তুহিন হাঁটতে শেখে, কথা বলা শেখে, ঘড়ি দেখা শেখে। দুই ভাই একসাথে স্কুলে যেত। একসাথে খেলতো। খুব দুরন্ত ছিল। তুহিন, খেলার সময় সবসময় 'শক্তিমান' সাজতো, আর মহীনকে না চেয়েও সাজতে হতো 'গদাধর'। একদিন শক্তিমান সেজে ছাদ থেকে উড়তে গিয়ে তুহিন সবাইকে ছেড়ে চলে যায়। মহীনের বাবা তুহিনের চলে যাওয়াকে মেনে নিতে পারেননি, দোষারোপ করেছেন মহীনকে। মহীন এখন পর্যন্ত নিজেকে অপরাধী মনে করে। মহীনের মা শুধু প্রয়োজনে কথা বলতো। তখন থেকেই মহীন নিজের একটা অন্য জগত তৈরি করে নেয়। সে স্বপ্ন দেখা শুরু করে। প্রথম দিকে স্বপ্নে শুধু বাবা মা আর মহীনই থাকতো। আস্তে আস্তে মা বাবা তাকে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু স্বপ্ন কখনও তাকে ছেড়ে যায়নি। স্বপ্ন তাকে সুখে রাখে। স্বপ্নগুলোর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কোনও কাল আছে কিনা তার জানা নেই। মহীন শুধু জানে, তার পছন্দের মানুষগুলো ঐ স্বপ্নের মধ্যেই তার সঙ্গে কথা বলে। কখন যেন স্বপ্ন দেখাটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু মহীন কোনোদিনও স্বপ্নে তুহিনকে আনতে পারেনি। তুহিনকে দেখতে খুব ইচ্ছে হয়।

সকালবেলা মহীন জানালায় দাঁড়িয়ে, আকাশের দিকে চেয়ে আছে। সে দেখতে পাচ্ছে, কালীপুকুরের ধারে সে তার ভাগ্নি পুতুলের সাথে বসে মাছ ধরছে। পুতুল খুব চঞ্চল, স্থির হয়ে বসে থাকতেই পারছেনা, দুরে একটা ছাগল চরছে, পুতুল গিয়ে ছাগলটার সঙ্গে খেলতে শুরু করে। মহীন তখনও পুকুরপাড়ে বসে মাছ ধরছে। পুতুলের কণ্ঠ তার কানে এলো,– 'মামা, ছাগলটার পায়ে একটা জোঁক বসে আছে, তুমি এসে জোঁকটাকে ছাড়িয়ে দাও।' জামিলের ডাকে মহীনের সম্বিত ফেরে। তার জন্য কে যেন চিঠি পাঠিয়েছে। মহীনের এখন নীতুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, চিঠিটা পরে পড়া যাবে। মহীন জামিলের মোবাইলটা নিয়ে নীতুকে একটা ফোন করল–

–হ্যালো, নীতু বলছ?

–বলো, কী বলছ?

–নীতু, তুমি আজ লাল শাড়ি পরে কলেজ এসো। আমি কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকব।

–খামোখা আমি শাড়ি পরে কলেজ যেতে যাব কেন? এখন কেউ বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া শাড়ি টাড়ি পরে কলেজ যায় না। তাছাড়া আমি তিনদিনের জন্য পিসির ওখানে যাচ্ছি, একটু পরেই বেরোবো।

–ভাবো, আজ আমার জন্মদিন।

–জন্মদিন মানে? তোমার জন্মদিন হলে কলেজের কী? তুমি কোন বিশেষ ব্যক্তি? রবীন্দ্রনাথ না নজরুল?

–নীতু, আমি তো তোমার বিশেষ কেউ।

–মহীন, তোমার এই স্বপ্নের কথা শুনে শুনে আমি ক্লান্ত। আর আজ হঠাৎ লাল শাড়িতে আসতে বলছ? কেন, তোমার স্বপ্নে কী এখন দোল উৎসব চলছে?

–নীতু, এভাবে বলোনা, তোমাকে মানায় না। তোমাকে বলেছিলাম না, আমাদের বাড়ির সামনে একটা শিমুল গাছ আছে। কাল রাতে দেখলাম ঐ গাছে লাল ফুলের মেলা বসেছে। ঐ ফুলগুলোতে তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। নীতু তুমি শিমুল ফুল।

–মহীন, তুমি বাস্তবে ফিরে এসো। তোমার স্বপ্ন-নেশা তোমাকে অলস করে দিচ্ছে, তুমি তোমার সব দায়িত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো। তুমি তোমার এই স্বপ্ন থেকে পাওয়া 'অলীক সুখ' নিয়ে সারাজীবন কাটাতে পারবে তো? চলো না মহীন, আমরা সংসার পাতি। তোমার গ্রামের বাড়িতে, সেখানে তো তোমার সব কিছু আছে, জ্যাঠা-জেঠিমা আছেন, তারা তো তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। সবাই মিলে এক সাথে থাকব, দেখবে সেখানে কত ভালো লাগবে। তখন দেখবে, তোমাকে আর একা একা স্বপ্ন দেখতে হচ্ছে না, কারণ যা কিছু সুন্দর তা তোমার চোখের সামনেই থাকবে।

–আচ্ছা।

–আচ্ছা মানে?

–ও, আমি তো ভুলেই গেছিলাম তুমি স্বপ্ন পাগল মানুষ। আমি ফালতুই এতো কিছু বকে গেলাম। এতদিনে যা হয়নি, তা আজ হঠাৎ হবে কীভাবে।

আচ্ছা, তুমি তোমার স্বপ্নেই আমাকে লাল শাড়িতে দেখে নিও। রাখলাম।

জামিল মহীনকে বলল, দাদা তুমি তোমার স্বপ্নগুলোকে একটা একটা করে লিখতে শুরু করো। তোমাকে একটা ডায়েরী কিনে এনে দিচ্ছি, তুমি আজই লেখা শুরু করবে। জামিল মহীনের উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

মহীন চিঠিটা হাতে নিলো, জ্যাঠা পাঠিয়েছেন—

প্রিয় মহীন,

ভালোবাসা নিও। কেমন আছো? আমাদের ব্যবসার অবস্থা এখন অনেক ভালো। তোমার পুরোনো সেই মেসের ঠিকানাতেই আমি নিয়মিত টাকা আর চিঠি পাঠাই। তোমার কাছে পৌঁছায় কিনা বুঝিনা। তোমার থেকে কোনো আমি উত্তর পাই না। তাই এবার শুধু চিঠি পাঠালাম, উত্তর পেলেই টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

মহীন, ফিরে এসো। আমার বয়স হয়েছে, তোমার এতো সম্পত্তি আমি আর একা সামলাতে পারছিনা। তোমার জেঠিটা রোজ তোমার জন্য কাঁদে, তোমাকে দেখতে চায়। বাবা, এবার একটা ডাক্তার দেখাও। এভাবে আর কতদিন চলবে?

চিঠি পেলে অবশ্যই উত্তর দিও। অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি

তোমার জ্যাঠামশায়

মহীনের কেমন যেন মন খারাপ করছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি মহীনকে ঘিরে ধরল।

মন ভালো করার জন্য মহীন এখন একটা স্বপ্ন দেখতে চাইছে। সে দেখছে, নীতু বাড়ির পেছনের বাগানটাই গাছগুলোতে সুন্দর করে জল দিচ্ছে। গরুটা হাম্বা-হাম্বা ডাকছে। মহীন হঠাৎ দেখতে পেল, পুকুর পাড়ে তুহিন ছুটোছুটি করছে। মহীন চিৎকার করে ছোটো ভাইকে ডাকছে। এতদিন ধরে যাকে সে দেখতে চেয়েছে, সে আজ তার চোখের সামনে, কিন্তু তুহিন কিছুতেই মহীনের ডাক শুনতে পাচ্ছে না। মহীন ছুটে গিয়ে পেছন থেকে তুহিনের ঘাড়ে হাত রাখল, তুহিন মহিনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'দাদা, কেমন আছো?' মহীন ভাইয়ের মুখ দেখে অবাক হয়ে গেল, 'তুহিন এখন জামিল'।

কারা যেন মহীনের ঘরের দরজার কড়া নাড়ছে, মহীন দরজা খুলে দেখে মেসের কয়েকটা ছেলে। ওদের থেকে জানতে পারে, রাস্তা পার হতে গিয়ে জামিলের এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মাথায় চোট পেয়েছে। অবস্থা গুরুতর। জামিল আর ফিরবে না।

মহীন খুব অসহায় বোধ করছে। ছেলেটার বাঁচা দরকার। তার স্বপ্নে না, বাস্তবে ছেলেটা বাঁচুক। কিন্তু... মহীন জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে আকাশের দিকে চেয়ে আছে, সে চাইছে সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখতে, কিন্তু স্বপ্নরা এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। স্বপ্নগুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে ছুটোছুটি করছে। মহীন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। জামিল এভাবে চলে যেতে পারে সেটা সে ভাবতেই পারছে না। হঠাৎ করেই মহীনের দৃষ্টি যায় চলন্ত রাস্তায়। বাস যাচ্ছে, কত মানুষ বাসে নামছে উঠছে। বাসের কন্ডাক্টর চিৎকার করছে, রিক্সাওয়ালা রিক্সা টানছে, স্কুলের বাচ্চাগুলো মায়ের হাত ধরে রাস্তা পার হচ্ছে। এক যুবতী বারবার ঘড়ি দেখছে। হয়তো প্রেমিকের অপেক্ষায়। ট্রাফিক পুলিশটা ঘামে ভিজে গিয়েও কাজ করে যাচ্ছে। মিষ্টির দোকানটায় ভিড় উপচে রাস্তায় পড়েছে। একটা কাক ডাস্টবিন থেকে কী যেন মুখে করে উড়ে পালাল। কাকটা কোথায় গেল? নিজের ঘরে? এতো পরিশ্রম, এতো ব্যস্ততা কীজন্য? ঐ বাস ড্রাইভার, ট্রাফিক, পুলিশ, স্কুলের বাচ্চাগুলোর ঘরে ফেরার তাগিদ রাস্তাটাকে আজ গতিশীল করে রেখেছে। ওদের ঐ তাগিদ যদি হারিয়ে যেত, তাহলে সব স্থির হয়ে যেত। দীর্ঘ বারো বছর পর এই প্রথম মহীন কাঁদছে। কান্নার ওপারে মহীন দেখতে পেল তিনটি মানুষকে। সে আজ চিনতে পেরেছে তাদের। আর চিনেছে নিজেকে, কতগুলি প্রাণবিয়োগের মধ্য দিয়ে। মহীনের আজ অনেক কাজ বাকি। সে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, হাসপাতালের উদ্দেশ্যে।

# সীমানা ছাড়িয়ে

**বৈশালী রায়চৌধুরী**

—ঠিক পৌঁছে যাব। বিকেল সাড়ে চারটা হবে হয়তো। ও হাঁ আরেকবার বলতো, পুঁচকির বেড নং,

—আর. জি. কর, বার্ন ওয়ার্ড, ৩৩ নম্বর বেড।

—ভাল নামটা যেন কি পুঁচকির?

—অরুণিমা, অরুণিমা গুপ্ত এখন,

—খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব দ্যাখো।

—আর আসা! সহ্য করা যাচ্ছে না রে ওর অবস্থা, অসম্ভব কষ্ট হবে ওকে দেখে। সহ্য করতে পারবি না রে।

—এটা কোনো কথা হল? তুই প্রতিদিন অতক্ষণ করে সহ্য করতে পারছিস, আমাকেও সহ্য করতে হবে। আর আমাদের তো দেখার কষ্ট, পুঁচকির সারা শরীরে বীভৎস কষ্ট। সহ্য তো করছে, করতে হচ্ছে, ঠিক আছে আয়। আমি থাকছি তুই আসা পর্যন্ত।

—না , না। তুই বাড়ি যা। আমি ঠিক খুঁজে নেব।

ফোনে কথা শেষ করে পিঠের ব্যাগে ফোন রাখে তিন্নি। এখন স্কুটি নিয়ে সোজা যাবে শ্যামনগর স্টেশন। স্টেশনে স্কুটি রেখে শিয়ালদা। তারপর সোজা আর. জি. কর। কালীপুজোর রাত্রে সন্ধ্যে দিতে গিয়ে মারাত্মক ভাবে পুড়ে যায় পুঁচকি। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে একই মফসসল শহরে বেড়ে ওঠা তার, পুঁচকির আরো অনেকের জায়গাতুতো বোন বলা যেতে পারে। একটা জিনিস তিন্নি ভালই বুঝতে পারে তাদের সমসাময়িক একই সাথে বেড়ে ওঠা রঘুনাথপুরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক আত্মিক বন্ধন আছে। সবাই সবার বিপদে যতটুকু পারে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে। স্টাডির ছোটো খাটটায় ছেলে ঘুমোচ্ছে। এবারে সামনেই তার আই এস সি। ডেকে বলে, আমি কলকাতায় যাচ্ছি পুঁচকি মাসিকে দেখতে। পড়তে বস। পাঁচটায় বোনকে আনতে যাবি কোচিং থেকে। পাপা ফিরলে টোস্টারে পাঁউরুটি সেঁকে বাটার লাগিয়ে দিবি। সময় মতো ফোন করব।

আর জি কর মেন গেটে দাঁড়িয়ে আছে অরিন্দম। তিন্নি না বলা সত্ত্বেও অরিন্দম তার অপেক্ষায় আছে। অরিন্দমও রঘুনাথপুরের, সে মূলত দেখাশোনা করছে পুঁচকির, পাঁচ দিন ধরেই।

—এখন কেমন আছে রে?

—একই রকম।

—তোকে তো বললাম, বাড়ি যা, কি দরকার ছিল অপেক্ষা করবার?

—ঠিক আছে রে। দাঁড়ালাম যদি না খুঁজে পাস।

—অফিস ছুটি নিয়ে করছিস তো সব। আর কেন? বাড়ি যা।

—রবিনরা খেতে গেল এইমাত্র। আশঙ্কাজনক অবস্থা কাটেনি রে। যদি কোনো প্রয়োজন হয় তাই আরও থাকলাম।

—কে থাকবে?

—তাও তো বটে। সবাই ফিরে গিয়েছে?

—কি করবে সবাই মিলে থেকে?

—চল,যাই।

সত্যিই সহ্য করা যাচ্ছে না পুঁচকির অবস্থা। ওর সুন্দর টুলটুলে মুখটা শুকিয়ে একটুকু হয়ে গেছে। পুঁচকির দুচোখ বেয়ে অঝোরে জল পড়ে যাচ্ছে। সান্ত্বনা দেবার ভাষারা এখানে অর্থহীন। সারা শরীর জুড়ে তীব্র উৎকট পোঁড়া গন্ধ। চিৎকার করে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল তিন্নি। চুড়িদারের ওড়নায় চোখটা মুছে দ্রুত বেরিয়ে এল। অক্সিজেন স্যালাইনের আড়ালে পুঁচকির মুখটা কেমন যেন, ধোঁয়া ধোঁয়া, অস্বচ্ছ।

—কোনো আশার কথা শোনাবি না অরিন্দম।

—নিশ্চয়ই শোনাবো, গোটা রঘুনাথপুর শহর যার সুস্থতার প্রার্থনা করছে, সেই প্রার্থনার নিশ্চয়ই দাম আছে।

—অরুন্ধতীকে খবর দিয়েছিলি?

—আমি না অরুণই খবর দিয়েছে। ওর বড় শালিকে

এই হাসপাতাল থেকেই।

—খুবই কান্নাকাটি করছে অরুন্ধতী?

—বলতে পারব না। এই পাঁচদিনেও একবার দেখতে আসেনি।

—মানে??

—রবিনের সরাসরি পুঁচকির  দিদির সাথে কথা হয়নি। যতবার ফোন করা হয়েছে, জামাইবাবু ধরেছে। বলেছে " মর্মান্তিক খবর, দেখছি।"

অরুন্ধতী অরুণিমা দুই বোন। অরুন্ধতীর থেকে অরুণিমা নয় বছরের ছোটো। পুঁচকি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে ওদের বাবা মারা যান। তারপর চাকরি পায় মা। সেই মাও পুঁচকির ক্লাস নাইনেই মারা যান। হঠাৎ করে ধরা পড়ে লাংস ক্যানসার লাস্ট স্টেজ। এক মাসের মধ্যেই উনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পুঁচকির দিদির অবশ্য তার আগেই বিয়ে দিয়ে যান। কারণ উনি ভেবেছিলেন পরিবারের একজন শক্তসমর্থ গার্জেন হয়ে উঠবে তাঁর জামাই। কিন্তু সব আশায় জল ঢেলে বিয়ের পর থেকেই অরুন্ধতী ও অরুন্ধতীর বরের পুঁচকিদের সাথে যোগাযোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। অরুন্ধতীকে শেষ দেখা যায় বছর ছয়েক আগে পুঁচকির বিয়েতে এক রাত্রির জন্য, তাও তার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়স্বজন ও দুজন আয়ামাসি সমেত। জিজ্ঞেস করলে বলে যে সে ভীষণ অসুস্থ, তার অভিশপ্ত জীবনের সাথে কাউকে জড়াতে চায় না।

—অরি কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। এতটা নির্লিপ্ত কেউ হতে পারবে না রে।

—জানি না। বলতে পারব না। আজ সকালেই মেমারি থেকে অন্তরা সুজয়রা হসপিটাল এসেছিল। আমাদের রঘুনাথপুরের শখানেক মানুষ পুঁচকিকে দেখতে এসেছে এই পাঁচ দিনে। প্রতিদিন অন্তত অজস্র ফোন আসছে পুঁচকি কেমন আছে জানতে চেয়ে। গোটা রঘুনাথপুররের যে যেখানে আছে সবাই পুঁচকির আরোগ্যের দিন গুনছে। আর সেইখানে ওর নিজের দিদির আচরণ।

—একদিন যাবি কোন্নগর?

—মাথা খারাপ, কোনো হৃদয়হীনার বাড়ি আমি যাই না।

—নারে বন্ধু হিসাবে আমারও দায়িত্ব আছে। আমি অরুন্ধতীর কাছে জানতে চাইব, কেন সে এমন করছে।

—বাড়ি যা তিন্নিদি। অনেকক্ষণ বেরিয়েছিস।

একই সঙ্গেই শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরে অরিন্দম আর তিন্নি। অরিন্দম হাসনাবাদ লোকাল, তিন্নি নৈহাটি লোকাল। আস্তে আস্তে ট্রেনটা ঢোকে শ্যামনগর প্লাটফর্মের সীমানায়।

আর জি কর বার্ন ওয়ার্ড, দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে ওঠে তিন্নি। আরও অনেকে অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে হব। পুঁচকি অনেকটাই ভালোর দিকে। অক্সিজেন খুলে দেওয়া হয়েছে। সময় লাগবে কিন্তু সেরে উঠবে এমন আশ্বাস পাওয়া গেছে। পুঁচকির ঠোঁটের কোনায় যেন মৃদু হাসি। এগিয়ে গিয়ে মাথায় হাত রাখে তিন্নি। চিন্তা করিস না বোন। আমরা আছি। তোকে বাঁচতে হবে। তোদের বাচ্চাগুলোর জন্য, রবিনের জন্য। হারিসনা, সেই কবে থেকেই তো লড়াই করছিস, এরপরও ঠিক পারবি।

নেমে আসতেই সবার সাথে দেখা মোটামুটি বেশির ভাগটাই রঘুনাথপুরের, পরিচিত মুখ। একটু কথা বলেই অরিন্দমের সাথে এগোয় তিন্নি। হসপিটালের ফাঁকা চত্বর পেরিয়ে, বড় রাস্তায় পা রাখে তিন্নিরা।

—আজ ভাল লাগবে রে তিন্নিদি, মনে হচ্ছে পুঁচকি লড়াইটা চালাতে পারবে।

—আমারও রিলাক্সড লাগছে। সবই করছি, হাসছি, খাচ্ছি, দৈনন্দিন জীবন চলছে নিজের মত করে তবু পুঁচকির অবস্থাটা কাঁটার মত বিঁধে ছিল। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না।

—তা তোর ছেলেমেয়ের খবর কি?

—ছেলে আইএসসি দেবে, মেয়ে নাইন চলছে। মোটামুটি স্বাবলম্বী।

—এতকিছু পারিস কি করে রে? দুই পিসির দেখাশোনা, বাবার তত্ত্বাবধান, সংসার, ছেলেমেয়ে। আবার সময়ে অসময়ে আত্মীয় বন্ধু সবার জন্যই ছুটে আসা?

—বাবা, তোর মুখে একথা মানায় না। তুই তো জনস্বার্থে হৃদয়, বিবেক সবই সঁপে দিয়েছিস, তাতো তোর চাকরি, সংসার সামলেই। গোটা রঘুনাথপুর

বিপদে পড়লেই তুই হাজির।

–বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

–একটুও না। আমি সব জানি। এই এত এত ব্লাড জোগাড় করা। প্রতিমুহূর্তের প্রতিটি প্রয়োজনে তুই আছিস। এই যে এত এত রাত জেগে রোগীদের সুস্থ করে তোলা। আমার অবদান কতটুকু বল?

–তোকে একটা কথা বলার আছে অরিন্দম। ফোনে আর ডিটেল এ গেলাম না।

–বল।

–আমি একদিন গিয়েছিলাম কোন্নগর এ।

–কোথায়?

–কোন্নগর, অরুন্ধতীর কাছে। অনেকগুলো কারণ, সন্দেহ উঁকি মারছিল তাই। যেমন ধর ও ফোন ধরে না কেন? একমাত্র বোনের প্রাণ সংশয় জেনেও একটা বারের জন্য আসতে পারল না, এটা মেনে নিতে পারছিলাম না। তাছাড়া সামাজিক ভাবে সবার সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করে চলার কারণ কী, বল তো এত কিসের অসহযোগিতা ও গোপনীয়তা?

–দেখা হল?

–হল, আবার হলও না।

–সে আবার কী?

–অনেকবার বেল টেপার পর তিনতলার একটা জানলা খুলল, একজন জিজ্ঞেস করল কে? আমি আমার নাম বললাম। অরুন্ধতীর বন্ধু তাও বললাম। কিছুক্ষণ পর অরুন্ধতীর মুখ জানলায়। বলল ও ভাল আছে। ভালো করে দেখতেও পেলাম না ওকে, দরজাটা খুলতে বললাম। অরুন্ধতী বলল যে চাবি নাকি ওর কাছে থাকে না। পরে আসতে বলল। আশেপাশের মানুষ জনকে জিজ্ঞেস করলাম ওদের কথা। কেউ কিছু বললই না। আদৌ ঠিক আছে তো অরুন্ধতী। শুনেছি ওরা ভীষণ ক্ষমতাবান। তা হোক। আমাদের সম্মিলিত শক্তির বাইরে তো নয়। কী রে সঙ্গে আছিস তো?

–নিশ্চয়ই, মানিকদা জানে তোর কোন্নগর আসার কথা?

–এখনও বলা হয়নি। দেখা যাক।

–একটা কাজ করে দিবি তিন্নিদি?

–বলই না

–এই আংটিটা নে, আর বদলে একটা বাচ্চাদের সোনার গলার চেন নিয়ে নিস। পারবি?

–না পারার কিছু নেই। আমার পরিচিত দোকান থেকেই না হয় নেব। কিন্তু কেন? তোর তো আংটিটা। পারিসও তো !

–আরে ছোটো হয়ে গেছে। আঙুলে টাইট হয়ে বসছে। তাছাড়া ওই ডিজাইন আর চলেও না। যদিও বাবা বিয়েতে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি করিস। সামনের শনিবার নেব। এক্সট্রা যা লাগবে লাগবে।

অরিন্দমের কথা শেষ হতে হতে ঢোকে বারাসাত লোকাল। ট্রেনে উঠে পড়ে অরিন্দম। গন্তব্য বিরাটি। বিরাটির এই দিকটা এখনও বেশ ফাঁকা ফাঁকা। ট্রেন থেকে নেমে একটু চিন্তা করে অটো না ধরে ফ্লাটের দিকে হাঁটতে থাকে অরিন্দম। বেশ শীত শীত লাগছে। কিছুটা ঠাণ্ডা বাতাস বড় করে নিয়ে ফুসফুসে ঢোকায় অরিন্দম। অনেকটা হালকা লাগছে। কদিন ধরেই মুখটা বিষণ্ন করে আছে বাবলী। সপ্তাহ তিনেক আগেই কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিল বাবলী তার নিজস্ব সঞ্চয় থেকে। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই তার একমাত্র দাদার মেয়ের অন্নপ্রাশন। একটা সোনার চেন দেবার বাসনা হয়েছে। তো যে টাকা অরিন্দমের আর নেই। পুঁচকির মণিকাকিমার রক্ত, প্রসূনের আলট্রাসেনো, রঘুনাথপুর থেকে আসা বিশ্বনাথ কাকার চিকিৎসায় কখন যে খরচ হয়ে গেছে। আজ আনছি তোমার চেন, কাল আনছি করেই বাবলীকে কাটাচ্ছে অরিন্দম। যাক আজ গিয়ে বলবে শনিবার আসছে তোমার ভাইপোর ভাইঝির চেন। হঠাৎ করেই বাম হাতের মধ্যমার দিকে চোখ যায় অরিন্দমের। দীর্ঘদিন ধরে চেপে বসার ফলে মোটা পুরু সাদা দাগ তৈরি হয়েছে। বাবলী চেপে ধরলেও নানাভাবে কাটাতে হবে। ভারী একটা মনখারাপ ছুঁয়ে যায়। তারপরই ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে অরিন্দম।

এ জীবনে প্রচুর মানুষের সঙ্গে চলাফেরার সুবাদে অনেক পার্থিব জিনিসের উর্দ্ধে ওঠা উচিত তার। দাদাকে চুল্লিতে ঢুকিয়ে দিয়ে এসে বাইরে লুচি আর একত্রিশটা রসগোল্লা দিয়ে জলখাবার সারে খুড়তুতো ভাই। বাবার মৃত দেহের সামনেই ডোমের সাথে

পাওনাগণ্ডা নিয়ে বাগবিতণ্ডা করে ছেলে। সদ্য বিধবা কাঁদতে কাঁদতেই খোঁজ নেয় স্বামীর শরীরের অলঙ্কার খোলা হয়েছে কিনা। শরীর নশ্বর জেনেও কোথাও কিছু ছাড়ে না মানুষ। ছাড়তে পারে না। কারণ মানুষ বড় বেশি বাঁধা তার সীমার মধ্যে। এসবের উর্দ্ধে উঠতে পারলে তখনই সীমানার বাইরে যেতে পারবে অরিন্দম। বড় পুকুরের পাশ দিয়ে বড় রাস্তা ধরে দ্রুত পা চালায় অরিন্দম। মন খারাপটাকে ভাসিয়ে দেয় জমাট কুয়াশার সাথে।

৭.২০ এর নৈহাটি লোকালে চেপে প্রথম ফোনটি আসে মানিক এর। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে তিন্নি। মানিক এর ফ্রেণ্ড ফিলোজফার অ্যাণ্ড গাইড শক্তিদার মেয়ের বিয়ে আজ। দুপুর থেকেই শক্তিদার বাড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে আছে মানিক। তাই মানিক জিজ্ঞেস করে কখন শক্তিদার বাড়িতে আসছে তিন্নি। তিন্নি জানায় যেতে অনেক দেরি হবে কারণ নৈহাটিতে বড় পিসিমা বাথরুমে পড়ে গিয়ে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন। উনি তো একাই থাকেন। আয়ামাসি নিয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে। তবু তিনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন, চাইছেন তিন্নি একবার আসুক। তিন্নি মানিককে বলে পিসিমাকে দেখে তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাবে শক্তিদার বাড়ি। রাগ করে ফোনটা কেটে দেয় মানিক। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তিন্নি।

দ্বিতীয় ফোনটা আসে সোদপুর ঢোকার মুখে। বড়পিসিমার আয়ামাসি ডাক্তারের চেম্বার থেকে ফোন করে জানতে চায় তিন্নি আসছে কিনা। তিন্নি অপেক্ষা করতে বলে। জানায় সে আসছে। চোখটা সামান্য বুজে এসেছিল, নৈহাটি ঢুকছে নৈহাটি লোকাল। কখন যে শ্যামনগরের সীমানা পেরিয়ে গেল বুঝতেই পারেনি তিন্নি।

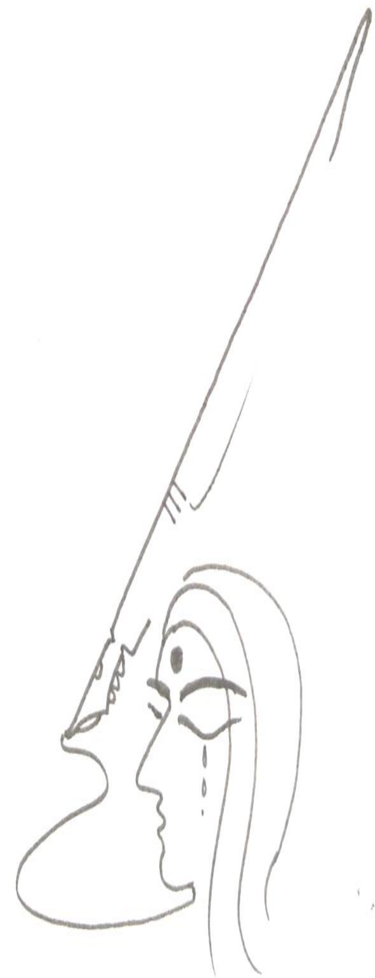

ছবি : হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

Mobile: 9474565652, GST No: 19AKXPM4633L1ZA , PAN NO : AKXPM4633L

# AMALENDU MANDAL

Government Contractor & General Order Suppliers

*Vill-Karakanali. P.O– Pathardoba.*

*Dist– Bankura. Pin– 722151*

# DIPAK KUMAR MANDAL

Government Contractor & General Order Suppliers

*Mobile: 9434438415*

*Vill– Kansachora. P.O– Machotora.*
*P.S– Simlapal. Dist– Bankura.*
*Pin– 722151*

Issue date 3 February 2019.
Vol. 1, Issue 1 Voice mark

আজ বিশ্ব মূল্য বৈষম্যে ভারসাম্যহীন। সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব ও রাজনৈতিক দিশাহীনতায় শ্রমমানস অস্থির। তার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যর্থ। এই সংকটাপন্ন পটভূমিতে শান্তি লক্ষ্যে-১। অস্তিত্ব: প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ) ১৫০. ২। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং... (বর্তন ক্রম: এক) ২০০. ৩। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং... (বর্তন ক্রম: দুই) ২০০. ৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং... ১২০ ।

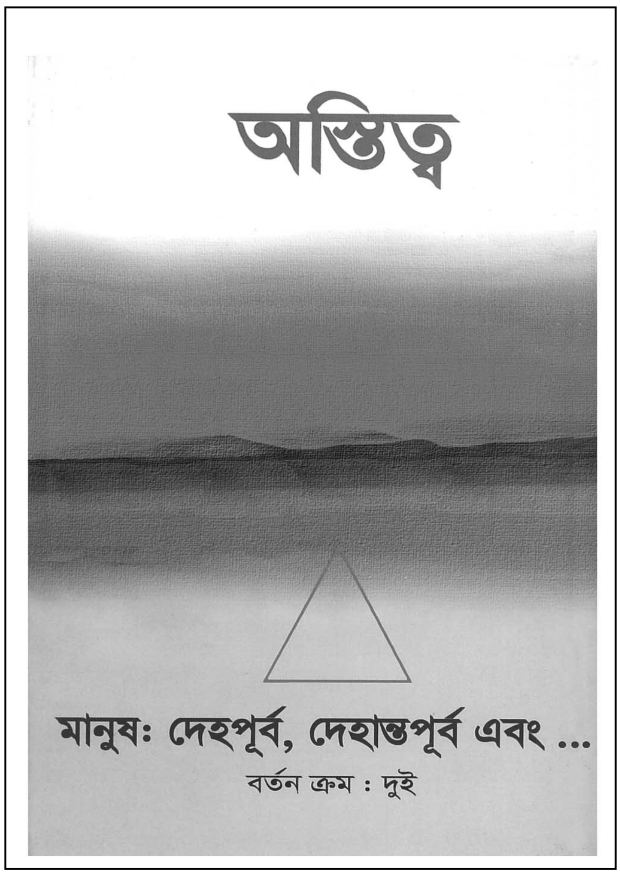


প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)

**Published by Md. Firoz Hossain from Pirtala, Upar Fatepur, Lalgola, Murshidabad, Pin-742148 and printed by him at M/s. KIS Offset Press, Berhampore, Murshidabad, Pin-742101.**